স্মৃতি-কণা

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

সম্পাদিত

সন্তানহারা পিতার নিদারুণ শোকে যে সকল সহৃদয় আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-সুধীগণের সান্ত্বনা ও সহানুভূতি হইতে স্মৃতি-কণার উৎপত্তি, তাঁহাদেরই নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাইবার এই অবসর। স্মৃতি-কণা দরদী ব্যক্তিদের গৃহে সাদরে রক্ষিত হয়, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্তার বিকার॥

তাঁরই সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তাঁরই চরণে কোটী কোটী নমস্কার!

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

বিনয়াবনত
জ্যোতিষ

সূচী

লেখক ও বিষয় | পত্রাঙ্ক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

'এ জীবনে অমৃত সে করিয়াছে দান' ... ৩

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—

শোকে সুখ ৫

মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি—

শোকে সান্ত্বনা ১১

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—

সান্ত্বনা ১৪

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

'কল্যাণী উমারাণী' ১৬

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—

শোকাপনোদন ১৭

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—

ব্যথা ২৫

স্মৃতি ৩৩

অশ্রু ৪৫

সূচী

লেখক ও বিষয়			পত্রাঙ্ক
শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস —			
বিদেহী সত্তার সঙ্গে চিরমিলন	...	...	৫১
সমবেদনা			
বঙ্গলক্ষ্মী	...	...	৫৩, ৫৬
অমৃতবাজার পত্রিকা	...	...	৫৯
সরোজ-নলিনী-নারীমঙ্গল-সমিতি	...	...	৬০
শ্রীমতী নীরজবাসিনী সোম	...	...	৬২
মহারাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী	...	...	৬২
স্যর জ্যোৎস্না ঘোষাল, সি. আই. ই., আই সি. এস	...	...	৬৩
বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, সি আই ই		...	৬৩
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী		...	৬৪
দেশবন্ধু-দুহিতা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী	...	.	৬৪
স্যর যদুনাথ সরকার	...	..	৬৫
লেডী অবলা বসু	...	..	৬৬
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সি আই ই		..	৬৬
বৌদি	...	...	৬৭
আশীর্মালা	.	.	৭১-৯৫
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—			
সান্ত্বনার বাক্য	.	..	৯৬

স্মৃতি-কণা

নিশারাণী

স্মৃতি-কণা

UTTARAYANA.
SANTINIKETAN, BENGAL.
16th Nov., 1935.

ওঁ

এ জীবনে অমৃত যে
করিয়াছে দান,
মৃত্যু তাই নিত্য নিত্য
করিছে প্রমাণ ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শোকে সুখ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, "অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্"—আনন্দঘন ব্রহ্মের বাহিরে সকলই আর্ত্তিময় অর্থাৎ "Life and Tragedy are the same"—সেই বুদ্ধদেবের অমোঘ বাণী "সব্বং দুক্খং।"

স্যর এডুইন্ আর্নল্ড ইহার সম্প্রসারণ করিয়া বলিয়াছেন,

"Ask of the sick, the mourners, ask of him
Who tottereth on his staff, lone and forlorn,
'Liketh thee life?'—these say, the babe is wise
That weepeth, being born." —*Light of Asia.*

অতএব (গীতার ভাষায়)—জগৎ 'দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।'

Pain is the fundamental fact in life; wherever life is, there is pain. (Canon Struter's *Reality*, p. 57.) এ কথা বাইবেলের প্রতিধ্বনি; যে হেতু 'The Bible is a library of Pessimism.........The Biblical writers knew the truth of the tragic version of life.' কারণ বাইবেলের ঋষি জানিতেন, দুঃখই জীবনপটের টানা ও পোড়েন। হিন্দু দার্শনিকেরও ঐ কথা। সমস্ত

দর্শনেরই আরম্ভ দুঃখবাদে—"তস্মাদ্ দুঃখং স্বভাবেন" (সাংখ্য) ; "হেয়ং দুঃখমনাগতম্" (পাতঞ্জল)।

ন্যায়দর্শনকার গৌতম বলেন—দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদ্ অপবর্গঃ। বৈশেষিক মতে—নিঃশ্রেয়স = আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি।

অতএব দুঃখই জীবনের মূল ঘটনা—"Suffering is the badge of all our tribe."

প্রাচীন গ্রীক্‌দিগেরও ঐ কথা। হোমারের ইলিয়ডে দেখিতে পাই—

"Of all that breathe
And walk upon the earth or weep, is nought
More wretched than the unhappy race of Man."
—*Iliad*, Bk. 17.

সফোক্লিস, যাঁহার সার্থক বিশেষণ—'the mellow glory of the Attic stage'—তাঁহার 'ইডিপুস' নাটকে বলিয়াছেন—"The happiest fate for man is not to be born at all, while the second best is to die, no sooner he sees the light."

প্রাচীনেরা বলিতেন দুঃখ ত্রিবিধ—আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিক। কিন্তু দুঃখ যতবিধ হউক না কেন, কোন দুঃখই প্রিয়বিয়োগের তুল্য মর্ম্মান্তিক নয়—তা'ই ভুক্তভোগী, মধুসূদনের ভাষায় বলেন—

"এই যে ত্রিশূল সতি ! দেখিছ এ করে
ইহার অধিক বাজে পুত্রশোক—
চিরস্থায়ী এ যাতনা ভবে।"

দরিদ্র পুত্র বা দয়িতা কন্যা অকালে যখন শোকসাগরে ভাসাইয়া অকস্মাৎ চলিয়া যায়, তখন বিধুর মাতাপিতা সান্ত্বনার স্থল কোথায়ও খুঁজিয়া পান না। অথচ সংসার-রঙ্গভূমে অনাদি কাল হইতে এ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় চলিতেছে—'অহন্যহনি ভূতানি।' বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধদেব সম্বোধি লাভ করিয়া যখন উত্তর-ভারতে মুক্তির মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন, তখন একদিন এক অনাথা বিধবা একমাত্র পুত্রের জননী, তাহার নয়নের মণি শিশুপুত্রের শব তথাগতের চরণতলে অর্পণ করিয়া কাতরকণ্ঠে মৃতপুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহিল, "বাবা! তুমি সব পার! আমার ছেলেটির প্রাণদান দাও।" বুদ্ধদেব স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "মা, যদি এক মুষ্টি ভিক্ষালব্ধ সরিষা আমায় আনিয়া দিতে পার তবে শিশুকে বাঁচাইতে পারি—কিন্তু বাছা! এমন বাড়ী হইতে ঐ সরিষা আনিবে, যে বাড়ীতে কোন শিশুর অকালমৃত্যু ঘটে নাই।" অনাথা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিল, কিন্তু দেখিল, প্রত্যেক গৃহই অকালমৃত্যুর আগার। তাহার আর সরিষা আনা হইল না। সে বুঝিল, 'মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাস্মি'—তখন তাহার শোক মন্দীভূত হইল।

দুঃখের এ বিশ্বব্যাপিতা লক্ষ্য করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার উপযোগিতার অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "What is the place of sorrow in the scheme of things?"—বিশ্বপতির বিধানে শোকের স্থান কোথায়? প্রিয়-বিয়োগের কি কোন সার্থকতা আছে? এক জনের সদুত্তর শুনুন—

> "O Life! O Death! O World! O Time!
> O Grave! where all things flow

'Tis yours to make our lot sublime
With your great weight of woe.
Though sharpest anguish hearts may wring,
Though bosoms torn may be,
Yet suffering is a noble thing,
Without it where were we ?"

—Archbishop Trench.

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও নিবিড় শোকের পর অনুভব করিয়াছিলেন—
" A deep sorrow hath humanised my soul." অর্থাৎ

"জীবের পবিত্রকারী এই মহাশোক !"

—নবীনচন্দ্র।

সেই জন্য ভক্ত কবীর বলিয়াছেন—

"বিরহ অগিন্ অন্তর জারে
তব্ পাওয়ে পদ পূরে।"

অগ্নির উত্তাপে যেমন স্বর্ণের শ্যামিকা দূর হইয়া বিশুদ্ধি ফুটিয়া উঠে, দুঃখের দ্বারা শোকের দ্বারাও জীবের সেইরূপ হয়। শোকাগ্নির দ্বারা জীবের সমস্ত মলা-মলিনতা দগ্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে জীবের স্বচ্ছ, শুদ্ধ বুদ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠে। শোকের এমনই পুটপাক। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এক টুকরা কয়লা ও এক খণ্ড হীরা অভিন্ন। রসায়নের দৃষ্টিতে উভয়ে অভিন্ন বটে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটি ময়লা কয়লা, অন্যটি মহোজ্জ্বল হীরা। কয়লা কি করিয়া হীরা হইল ? যুগযুগান্তর ধরিয়া পুটপাকে পুড়িয়া এবং অজস্র চাপ খাইয়া। জীবের পক্ষেও এই নিয়ম। যদি জীবকে Diamond-Soul (বজ্র-সত্ত্ব) হইতে হয়, তবে

তাহাকে বিয়োগ-অগ্নিতে পুড়িতে হইবে এবং গুরুতম যন্ত্রণার ভারে পীড়িত হইতে হইবে। সেই জন্য একজন অভিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন—

"The world is a forge for steeling souls."

জগতের অতীত ইতিহাস যাঁহারা চরিত্র-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা তীব্র দুঃখানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়াছেন—অথচ সেই দুঃখ বিধাতার বজ্র বলিয়া সাদরে শিরে ধারণ করিয়াছেন। ইঁহারা উচ্চ অধিকারী। বিধাতার বিধান এই যে, যাঁহারা কোমল অধিকারী, তাঁহাদের সম্বন্ধে "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে" অর্থাৎ "Heaven tempers the wind to the shorn lamb."—তৃণিত মেষের পক্ষে মৃদুমন্দ পবন। কিন্তু যিনি উত্তম অধিকারী, তাঁহার উপর এই ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত। তাঁহার পক্ষে নিয়ম

"যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।"

সেই জন্যই দেখা যায় যুধিষ্ঠির, নল, রামের ন্যায় উত্তম পুরুষও দুঃখের, শোকের, সন্তাপের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই —

"তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ।"

কিন্তু এত দুঃখেও তাঁহাদের হা-হুতাশ নাই, আর্ত্তনাদ নাই, হতবিধির প্রতি অভিযোগ নাই। তাঁহাদের প্রজ্ঞাপূত দৃষ্টিতে এ সমস্তই বিধাতার 'কৃপাদণ্ড'—

"ওহে নাথ কৃপাদণ্ডে
শুদ্ধ কর এ পাষণ্ডে।" —নরোত্তম।

যিনি বিয়োগ-দুঃখ ভোগ করেন তাঁহার পক্ষে এই কথা; কিন্তু যে চলিয়া যায় তাহার পক্ষে কি? অবশ্য তাহার আত্মার কিছু ক্ষতি হয় না—কারণ, আত্মা ত' অজর অমর—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' অতএব শরীর যদি জীর্ণ হইয়া থাকে তবে 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়'—জীর্ণ বাস পরিবর্ত্তন করিলেই ত' মঙ্গল। কিন্তু যাহারা তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী—অকালমৃত্যুতে তাহাদের কি কল্যাণ? প্রাচীন গ্রীকরা বলিতেন বটে "Those whom the Gods love die young." কিন্তু প্রশ্নটি কুজ্ঝটিকাময়—নিঃসংশয়ে কিছু বলা কঠিন। তবে আমরা যখন বিধাতাকে মঙ্গলময় বলিয়া মানি, তিনি যখন 'শঙ্কর', 'শুভঙ্কর' এবং যখন তাঁহার অনভিমতে 'পাতাটি নড়ে না—পাখীটি পড়ে না,' তখন মৃত্যুর মত একটা প্রকাণ্ড ঘটনা যদৃচ্ছায় সংঘটিত হয় —এ কথা স্বীকার করা যায় কি? আমার এক 'সূক্ষ্ম'দৃষ্টিশালী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি কয়েকজন তরুণ-তরুণীর অকাল-মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা পরীক্ষা করিয়াছিলেন,—প্রত্যেক স্থলেই দৃষ্ট হইয়াছিল—ঐ ঐ আত্মার পক্ষে সেই অকালমৃত্যুর ফল কল্যাণপ্রদই হইয়াছিল—যে আবেষ্টনীর মধ্যে সেই সেই আত্মা আবদ্ধ ছিল, দেহ-মুক্ত হইয়া তাহারা নবতর, কল্যাণতর বিবর্ত্তনের পথে দ্রুততর অগ্রসর হইয়াছিল। বস্তুতঃ আমাদের অল্প দৃষ্টি, আমরা একদেশদর্শী—সমগ্রটা ধরিতে পারি না। যদি পারিতাম তবে বোধ হয় কবি ব্রাউনিংএর ভাষায় বলিতাম—"God's in His heaven, all's well with the world!"

শোকে সান্ত্বনা

মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মোহন্ত মহারাজ

"ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি, সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেহস্তু, তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥"

আমার বাগিন্দ্রিয়, আঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষুঃশ্রোত্রেন্দ্রিয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ তৎপুরুষ-চিন্তনে আপ্যায়িত হউক। এই যে যত কিছু সব ব্রহ্ম। ইহাই উপনিষৎ। আমি যেন ব্রহ্মকে প্রত্যাখ্যান না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন, সব অপ্রত্যাখ্যাত হউক, অপ্রত্যাখ্যাত হউক।

এইরূপে সেই আত্মবস্তুতে নিরত আমাতে উপনিষদের ধর্ম্মসকল উপস্থিত হউক, উপস্থিত হউক।

যে ওঁকাররূপী ব্রহ্ম সর্ব্বশান্তির আধার তচ্চিন্তনে আমার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় প্রশান্ত হউক।

সংসারী জীব-মাত্রই সুখদুঃখ-রোগশোকপূর্ণ সংসারে আসে, তখন ফলনোন্মুখ কর্ম্মসমুদয় পাপপুণ্যাত্মক দেহের সৃষ্টি করে।

দুগ্ধে মিশ্রিত জলবিন্দু যেমন দুগ্ধ হয় না, তেমনি আত্মা সংসারের শোকতাপে লিপ্ত হন না। এক মন দুধে এক ছটাক জলের অবস্থিতিবৎ একীভূত বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ একীভূত হইতে পারে না। এই বেদান্ত-প্রকাশক বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সংসারপথে চলিলে অজ্ঞানসম্ভূত অশান্তি দেহস্থ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই দেহস্থ পুরুষই 'আমি' পদবাচ্য—তাঁহা 'আমার' এই পদবাচ্য সমস্ত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। 'আমার' অভিধেয় স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহে উৎপন্ন উপদ্রবরাশি হইতে আমি স্বতন্ত্র—এই বিচারবুদ্ধি সর্ব্বদা জাগ্রৎ রাখা কর্ত্তব্য। ইহাই শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। 'আমি' পদবাচ্য যিনি তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালে থাকেন। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-কালে যেমন ভাবে 'আমি'র অবস্থিতি জানা যায়, তেমনি শুধু তিন কাল কেন তিনি ত্রিকালাতীতও বটেন। সেই যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

দেহ বিনষ্ট হয়, দেহী বিনষ্ট হন না। যদি কেহ প্রেতত্ব-প্রাপ্ত

দেহীর সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করিতে চায়, তাহা হইলে সেই দেহী যে লোকে গমন করিয়াছেন সেই লোকে গমন করিলে তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ করা যায়। ইহাই আমরা মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য পৌরাণিক আখ্যান হইতে জানিতে পারি।

বর্ত্তমান যুগে Psychic Research দ্বারা মৃত্যুর পরেও আত্মার অবস্থিতির বিষয় জানা যায়। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। এ কারণ, বন্ধুবিয়োগ অদর্শন-জনিত বিরহমাত্র, চিরতরে সম্বন্ধের উচ্ছেদ নহে। সুতরাং শোকের কোন কারণ নাই। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।"

বিদেশগত আত্মীয়ের সহিত পুনর্মিলনের অপেক্ষায় যেমন লোকে শান্তচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ প্রেত-ভাবাপন্ন আত্মীয়ের জন্য শান্তচিত্তে অপেক্ষা করা বিহিত।

সান্ত্বনা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মানুষের মনের একটি বিশিষ্ট গুণ স্মৃতি। স্মৃতি-শক্তির সাধনই মানসিক উন্নতির একটি চরম উপায় বলিয়া আমরা তাহারই চেষ্টায় নিয়ত নিযুক্ত আছি। কিন্তু আলোর পিছনে যেমন আঁধার, স্মৃতিব পশ্চাতে তেমনই ভ্রান্তি। আঁধার না থাকিলে আলো কে ভালবাসিত? ভ্রান্তি না থাকিলে স্মৃতির আদর কে করিত? কিন্তু শুধু তাই নয়। ভ্রান্তি আমাদের মনের ক্ষতে প্রলেপ বুলাইয়া দিতে অদ্বিতীয়।

শোকে সান্ত্বনা কেহ দিতে পারে না—ভগবৎকৃপা বিনা শান্তি নাই। ভগবৎকৃপা লাভ করা অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের ফল। কিন্তু আমাদের মত প্রাকৃত জনের সান্ত্বনা ভ্রান্তিতে। ভুলিতে আমরা চাহি না, তাহা জানি। কিন্তু ভ্রান্তি তাহার তূলি বুলাইয়া দিয়া ক্ষতচিহ্ন ঢাকিয়া দেয় মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে। যদি তাই হয়, ভ্রান্তিকে বরণ করিতে ক্ষতি কি?

আমরা কত কি মনে রাখিতে চেষ্টা করি। মনের আঁচলে গিঁঠ বাঁধিয়া কত কি ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু গিঁঠ আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে কোন অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে।

ভুলিয়া যাইবার একটি গুণ এই যে, অন্য দিকে স্মরণ নিয়োগ করিতে পারি। যদি তাই হয়, বন্ধু, তবে সেই স্মরণ তোমার

কাজে লাগুক। স্নেহের পুতলিরা আঁখির আগে আর নাই। তাহারা সরিয়া গিয়াছে। সেই শূন্য আসনে বসাও তাঁহাকে— যিনি শেষ পর্য্যন্ত আর সমস্ত রিক্ত করিয়া এমন ভাবে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার আশ্রয়েই মানুষের চরম ও পরম শান্তি। সেই ত সুখ! সেই ত সান্ত্বনা!

"যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি,
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম॥"

কল্যাণী উমারাণী,

তুমি ইহলোকে আনন্দদায়িনী ছিলে, পরলোকেও বিধাতা তোমার উপর আনন্দ-বিতরণের ভার দিয়াছেন কল্পনা করিয়া আশ্বস্ত হই। আমরা যখন সেখানে যাইব, আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিও।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

উমারাণী ঘোষ

শোকাপনোদন

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

সংসারে নানা বিষয়ে নানা লোকের নানা মত থাকে; কেহ বলেন এক, অন্যে বলেন আর এক, এই মতভেদের সীমা-পরিসীমা নাই, কিন্তু এমন একটি বিষয় আছে যাহাতে সকলেরই মত এক। ইহা হইতেছে মৃত্যু, মৃত্যু হইলে জন্ম হইতেও পারে, নাও হইতে পারে; কিন্তু জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই হইবে, ইহাতে কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তা তাহা কেহ ইচ্ছা করুক আর নাই করুক। তবুও মানুষের মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ইচ্ছা, অমৃত হইবার ইচ্ছা জন্ম হইতেই আছে, ইহা তাহার স্বাভাবিক। সে নাই—এ চিন্তা সে নিজে করিতে পারে না। তাই ভগবদারাধনারই দ্বারা বা অন্য যে কোনো উপায়েই হউক সে মরণের অতীত অবস্থাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। মনে করিতে পারি না, তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শারীরিক মৃত্যুকে এড়ান যায় না সত্য, কিন্তু শরীর ছাড়াও কিছু আছে, এবং পণ্ডিতেরা বলেন, তাহার সঙ্গে মৃত্যুর সম্বন্ধ নাই।

নিজেরই হউক আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যাহারই হউক, শরীরকে বরাবর টিকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। ইহা প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। এ নষ্ট হইবেই। আশ্চর্য্য, তবুও আমরা চাই তাহা যেন নষ্ট না হয়। যাহা হইবার নহে তাহার

জন্য ইচ্ছা করা আর শিশুর চাঁদ ধরার চেষ্টা একই। বৃষ্টিতে আমার ক্ষতি হয়, রৌদ্রে আমার কষ্ট হয়, ঝড়ে আমার অসুবিধা হয়। ইহা সত্য, কিন্তু তাহাতেই যে ঐ সব হইবে না, ইহা তো কখনো হয় না। তেমনি আমার নিজের অথবা আমার আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইবে না, ইহা হয় না। আমি চাই বা না চাই ওসব হইবেই। ভাল না লাগিলে তাহার প্রতিকার নিজেকেই করিতে হইবে। বৃষ্টি পড়িলে তাহা হইতে রক্ষার জন্য ঘর বাঁধিতে হয়। এ ঘরখানি যে যত ভাল করিয়া বাঁধিতে পারে সে তত ভাল থাকিতে পারে। অপর পক্ষে, যে ঘর না বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আর বৃষ্টিকেও সহিতে না পারে, তাহার দুঃখ অবধারিত। বৃষ্টির দুঃখে চঞ্চল হইয়া চীৎকার করিয়া তাহার লাভ নাই।

মৃত্যুও এইরূপ। ইহা অপরিহার্য, অপ্রতিকার্য, ইহার প্রতিকার নাই, অর্থাৎ ইহাকে এড়ান যায় না। কিন্তু ইহা অসহনীয় নহে। মৃত্যুশোক শেলের মত আসিয়া বুকের পাঁজর ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলে, সত্য কথা। তথাপি বলিব, ইহা সহা যায়। কাল একটা পরম ঔষধ, ধীরে ধীরে ইহা তাহাও সহাইয়া দেয় যাহা একদিন নিতান্ত দুঃসহ বা অসহ্য বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় ঔষধ হইতেছে জ্ঞান বা ভাবনা। জ্ঞানীরা বলেন, জীব মরে না, স্থূল দেহটাই যায়। পুরাতন কাপড় ফেলিয়া দিয়া মানুষ নূতন কাপড় পরে, সাপ পুরাতন খোলসটা ছাড়িয়া চলিয়া যায় ; এই জন্মেই তো দেখা যায়, শৈশবের শরীর হইতে যৌবনের শরীর, যৌবনের শরীর হইতে বৃদ্ধ বয়সের শরীর ভিন্ন, অথচ মানুষটি একটির পর একটি, তারপর আর একটি

শরীরকে ছাড়িয়া যেন চলিয়া আসিয়াছে। জ্ঞানীরা বলেন, মৃত্যুতেও তো এমনই দেহের পরিবর্তন মাত্র হয়। ইহাই তো মৃত্যু। ইহাতে ভয় কোথায়? দুঃখেরই বা কারণ কি? মানুষ যদি এই তত্ত্ব ভাবনা করে, ধ্যান করে, উপলব্ধি করে, মৃত্যুতে তাহার দুঃখ হইবার কথা নহে।

মানুষ আসে। কোথা হইতে আসে, সে জানে না। যখন আসে তখন তাহার কি আছে না আছে, কে আছে বা নাই, এ সব সে কিছুই জানে না। পূর্বেই বা তাহার কোথায় কে বা কি ছিল বা না ছিল তাহার কিছুই জানা থাকে না। আবার যখন যায় তখনো সে জানে না কোথায় যাইতেছে, যেখানে যাইতেছে সেখানে কেমন কি, কে তাহার আছে না আছে, কিছুই তাহার জানা থাকে না। তাহার আদি অন্ত উভয়ই অব্যক্ত। জ্ঞানী বলেন, এ অবস্থায় তোমার দুঃখ করিবার তো কিছু নাই। ভাবিয়া দেখ না।

তিনি আবার বলেন, তুমি তোমার শক্তির অতিরিক্ত কিছুই করিতে পার না, তা তুমি যতই না কেন ইচ্ছা কর আর চেষ্টা কর। তুমি স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল-- ত্রিভুবন আলোড়ন কর, মৃত্যুকে যখন কিছুতেই ঠেকাইতে পার না, তখন সে জন্য শোক করিয়া, দুঃখ করিয়া লাভ কি? যদি কিছুমাত্রও লাভ দেখা যাইত তবে আরো শতগুণ অধিক শোক করিবার জন্য তোমাকে বলিতাম। কিন্তু নিজেই ইহার পরিণাম তো দেখিতেছ। শোক যত করা যায় ততই তাহা না কমিয়া বাড়িয়াই উঠে। শোকে ধীর হইয়া— অচঞ্চল হইয়া থাকাই পণ্ডিতের কাজ।

সুখ-দুঃখ কাগজের এ-পৃষ্ঠা ও-পৃষ্ঠার মত, অর্থাৎ কাগজের এক পৃষ্ঠা থাকিলে যেমন অপর পৃষ্ঠা থাকেই, তেমনি তুমি যদি

সুখ চাও তো দুঃখকেও পাইতে হইবে। তুমি যদি সুখ ছাড়িয়া দাও, দুঃখও যাইবে। লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান—এই সব দ্বন্দ্বের অতীত হও। লাভও যেন তোমাকে চঞ্চল না করে, ক্ষতিও যেন তোমাকে চঞ্চল না করে। এই সকলেরই মধ্যে যেন সমানভাবে স্থিরভাবে তুমি থাকিতে পার। দেখিবে, তোমার প্রিয়জনের মৃত্যু তোমাকে কাতর করিতে পারিবে না।

ভক্তেরা বলিবেন, তোমার যদি ভগবানে ভক্তি থাকে তো তরিয়া গেলে। তোমার শোকের দুঃখের সম্ভাবনাই নাই। চাঁদ যদি একবার আকাশে দেখা দেয়, তবে সূর্যের তাপ আর থাকিতে পারে না। তেমনি ভগবান্ যদি একটিবার হৃদয়ে উদিত হন, তবে তাঁহার চরণপদ্মের স্পর্শে তোমার মন প্রাণ দেহ সবই সুশীতল হইয়া যাইবে, সেখানে দুঃখ-শোক-তাপের কোনো লেশ থাকিবে না।

মহারাজ পরীক্ষিতের আর সাত দিন মাত্র আয়ু রহিয়াছে। তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া আছেন। চারিদিকে কত শত ঋষি, মুনি, ভক্ত ও সজ্জন আসিয়াছেন। কুমার-ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীভগবানের গুণকথা লীলাকথা শুনাইতেছেন। আর মৃত্যু আসন্ন হইলেও মহারাজ পরীক্ষিত পরমানন্দে বলিতেছেন,— 'ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণার জ্বালা বড় দুঃসহ। আমি জলও স্পর্শ করিতেছি না, কিন্তু, হে প্রভু, আমার কোনো কষ্ট নাই। আপনার মুখকমল হইতে যে হরিনামামৃত নির্গত হইতেছে তাহাই পান করিয়া আমি পরিতৃপ্ত আছি। তক্ষকই হউক আর অন্য যে-কোনো মৃত্যুই সম্মুখে আসুক না, হে ভগবন্, আমি ভয়

করি না। আপনি আমাকে অভয় দেখাইয়া দিয়াছেন, আমি পরমানন্দরূপ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়াছি।' পরীক্ষিতের এই ভাব দর্শন করিয়া সূত বলিয়াছিলেন, 'কি আশ্চর্য্য, সম্মুখে প্রাণসংহারক তক্ষক থাকিলেও মহারাজ পরীক্ষিতের কোনো ভয় নাই, কোনো মোহ নাই, তিনি যে এখন ভগবানে নিজের চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন।' পরমভাগবত প্রহ্লাদের জীবনে কী দেখা গিয়াছিল? মহারাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কত উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন,—পর্ব্বতের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, হাতীর পায়ের তলে ফেলিয়াছিলেন, আগুনের মধ্যে ফেলিয়াছিলেন, বিষ-প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। বালক প্রহ্লাদ ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ঠিকই ছিলেন। ভাগবত শাস্ত্রে এ কথা বার বার বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হরির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার শারীরিক বা মানসিক কোনো দুঃখই থাকে না। মধুসূদন যদি হৃদয়ে থাকেন তবে দুর্বাসার শাপ বা ইন্দ্রের বজ্র কিছুই করিতে পারে না। ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন, শিব, ইন্দ্র, অগ্নি অথবা অন্য যে-কোনো দেবই হউন, কোনো বৈষ্ণবকে পীড়ন করিতে পারেন না। ভগবদ্-ভক্তের শক্তি ঐরূপই।

সব লোক সব জিনিসকে একরূপে দেখেন না। কেহ কোনো-কিছু ভাল বলিলে অন্যে তাহা মন্দ বলে। মতভেদের সীমা-পরিসীমা নাই। তাই আমাদের চোখে যেটা যেমন, ভক্তদের কাছে সব সময়ে তাহা তেমন নয়। আমরা চাই দুঃখ এড়াইতে, সাধকেরা ভক্তেরা তাহা চান আঁকড়াইয়া ধরিতে। দুঃখ আসিলে আমরা তাহা নিগ্রহ মনে করি, তাঁহারা তাহা অনুগ্রহ মনে করেন। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'হে

জগতের গুরু, আমাদের যেন সর্ব্বদা বিপদ্‌ই হয়, তবেই আমরা তোমাকে দেখিতে পাইব, যাহাতে এই সংসার আর দেখিতে হইবে না।' বামন-উপাখ্যানে বামন যখন নিজের তিন পদের দ্বারা সমস্ত অধিকার করিয়া বলিকে পরাভূত করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভু, আমরা অসুর, তুমি আমাদের প্রচ্ছন্নভাবে পরম গুরু। আমরা নানামদে অন্ধ হইয়া ছিলাম, কিছু দেখিতে পাইতেছিলাম না, তুমি আজ আমাদিগকে চক্ষু প্রদান করিয়াছ, যাহাতে আমাদের সমস্ত গর্ব নষ্ট হইবে। যোগ্যতম ব্যক্তি যদি দণ্ড প্রদান করেন, মানুষের পক্ষে তাহা শ্লাঘ্য--যে দণ্ড মাতা, পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধুগণও দিতে পারেন না। আজ তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়াছ, বরুণ আমাকে পাশ দিয়া বন্ধন করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে, তুমি উপকারই করিয়াছ, আমার লজ্জাও নাই, ব্যথাও নাই।' বলি ছিলেন প্রহ্লাদের পিতামহ। এই সময়ে প্রহ্লাদও এখানে উপস্থিত হন। তিনি এই ঘটনা দেখিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন, 'প্রভু হে, এই উচ্চ ইন্দ্রপদ তুমিই ইঁহাকে দিয়াছিলে, আর আজ তুমিই ইহা অপহরণ করিলে। ইহা ভালই হইয়াছে। মনে হয়, যে শ্রীসম্পদে ইঁহার মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তুমি তাহা কাড়িয়া লইয়া ইঁহার উপর পরম অনুগ্রহই করিয়াছ।'

ভাগবতেই আছে, মানুষ যখন সংসারের কাজকর্মে ডুবিয়া থাকিয়া 'আজ এ করিব, কাল তা করিব' ইত্যাদি নানা কল্পনা-জল্পনায় মত্ত হইয়া থাকে, অনবহিত হইয়া থাকে, তাহার পরম কল্যাণের কথা ভাবিবার অবসরমাত্র থাকে না, তখন যিনি তাহার পরম আত্মীয়, যিনি সব সময়েই তাহার কল্যাণ চিন্তা করিয়া থাকেন; সেই ভগবান্ তো অনবহিত হইয়া থাকেন

না,—তিনি দেখেন সে কেবল বিষয়ভোগে ডুবিয়াই যাইতেছে, তাহার লোভ না কমিয়া ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে, তিনি ইহা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, সাপ যেমন ক্ষুধার সময়ে জিহ্বা লক্‌লক্ করিয়া দৌড়িয়া গিয়া ইন্দুরকে ধরে, তিনিও সেইরূপ অন্তকের মূর্ত্তিতে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। এইরূপেই তিনি তাহাকে শিক্ষা প্রদান করেন।

ভাগবতে ভগবানেরই উক্তিরূপে এক স্থানে (বলি-বন্ধন উপাখ্যানে) বলা হইয়াছে,—'আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, আমি তাহার লোকজন কাড়িয়া লই, কেননা, ইহাদেরই অহঙ্কারে সে আমার ও এই লোকের অবমাননা করে। সৎকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য, বয়স, বিদ্যা, ধন ইত্যাদির দ্বারা যদি কাহারো অহঙ্কার না হয়, তবে জানিও তাহা আমারই অনুগ্রহ।' আর এক স্থানে ভগবান্ বলিয়াছেন,—'জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও সৌন্দর্যের দ্বারা মানুষের অহঙ্কার বাড়িয়া উঠে, এবং তাহা হইলে সে তখন আর আমাকে ডাকিতে পারে না, কেননা, যাহারা অকিঞ্চন—যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাই আমাকে পায়।' তাই ভক্তের দৃষ্টিতে এ সব দুঃখ দুঃখই নহে।

ভক্তেরা বলেন, আমরা অনেক সময়ে দুঃখের প্রতিকার বলিয়া যাহা ধরিতে যাই তাহাও যে দুঃখ তাহা বুঝিতে পারি না। সত্যই তো কবি আমাদিগকে বলিয়াছেন--

সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ।
সুখ বলে' দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ বলে' সুখ দিয়েছ।

হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে।
সুখ সুখ করে' দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে।
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে।
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমার দুয়ারে।

—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যথা

জগৎ আছে স্রষ্টার ইচ্ছায়; জগৎ চলে বিধাতার বিধানে। ভগবানের নব নব লীলা নিত্য ঘটে এ জগতে। কাল অনন্ত; জগৎ অসীম; অথচ প্রশান্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ! সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ! জগৎ সুন্দর ও আনন্দময়, ইহাই জ্ঞানীরা উপলব্ধি করেন। সাধকেরা ধারণা করেন, জগৎ বড় সুখের, ঈশ্বর বড়ই করুণাময়। সংসারের নানা পীড়নের মধ্যেও মানব ভগবানের করুণা পায়। এক অমানুষিক অব্যক্ত শক্তিই এ জগৎ পরিচালন করিয়া থাকে। সেই শক্তির নিকট সমস্ত জড়শক্তি পরাভূত!

ঈশ্বর দীপ্ত সৌন্দর্য্যময়! সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপ! তবু সৃষ্টি দুঃখ, যন্ত্রণা, দ্বেষ, হিংসা, অবিচার ও উৎপীড়নে পূর্ণ। ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা! তবে তাঁর সৃষ্টিতে দুর্ব্বলের উপর অন্যায় পীড়ন কেন? ভগবান্ আনন্দময়! তবে তাঁর সৃষ্টিতে মানব দুঃখ পায় কেন? আমরা দুঃখে কাতর হইয়া, অত্যাচার-পীড়িত হইয়া ঈশ্বরের বিধানে অনাস্থা প্রকাশ করি। আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে যাহা দুঃখ, ঈশ্বরের অসীম মহিমায় তাহাই করুণা। আমাদের বিকৃত দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, বিধাতার নির্ম্মল দৃষ্টিতে তাহাই সুন্দর।

মুনি-ঋষিরা সেই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাঁরা সেই জন্য মানবকে অমৃতের পুত্র বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, সত্যং শিবং সুন্দরের উপাসক হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বিষয়ী মানব আত্মজ্ঞান ও আত্মগরিমায় চিত্ত ভরিয়া রাখে, নানা আশায় প্রলুব্ধ হয়; পরম পদার্থ অমৃতের সন্ধান তাই পায় না। কূটবুদ্ধিতে মানব মনকে প্রবোধ দেয়, বলে দুঃখের অস্তিত্ব না থাকিলে সুখের অনুভব হয় না, কুৎসিতই সৌন্দর্য্যের মহিমা বৃদ্ধি করে। বিধাতা যেমন করুণাময় তেমনি দুঃখের প্রবর্ত্তক।

বৈজ্ঞানিকেরা তর্ক তোলেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন,—"বৈজ্ঞানিক বলিবেন, প্রকৃতিতে করুণা নাই। যে একটু সুখ বিদ্যমান, দুঃখ হইতে তাহার উৎপত্তি, দুঃখেই বুঝি সমাপ্তি। ধর্ম্মের জয়- -মিথ্যা কথা, প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে। স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয়, শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মেরই জয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের সমান গতি; উভয়েরই বিনাশ। এ কথার উত্তর নাই। কেহ বলেন, বিধাতার উদ্দেশ্য Behind the veil—মানব দৃষ্টির অন্তরালে। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলেই মানিয়া থাকে, ঈশ্বর ইচ্ছাময়, কোন্ সময়ে, কিরূপে কোন্ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বলিবার উপায় নাই। মানব যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছারই বিকাশ-মাত্র।"

সৃষ্টির রহস্য ভেদ করিবার জন্য চিরকাল চেষ্টা হইতেছে। যে ভাবের ব্যাখ্যায় মানবের মন তৃপ্তি লাভ করে, সে ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের সাধনায় কিছু মিলিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের চিন্তা-শক্তি যখন মানবের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য কিছুই ভেদ করিতে পারে না, তখনই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপী শক্তিতে ও করুণায় মানবকে বিশ্বাস

করিতে হয়। তখনই ভগবৎ-চরণে মানব আত্মসমর্পণ করে, তাঁরই করুণা লাভ করে।

হে মঙ্গলময়! তোমার সকল লীলাই মঙ্গলময়! তবে মানব কেন নিদারুণ ব্যথা পায়? দয়ার প্রস্রবণ তুমি, তোমারই লীলায় কি মানব-প্রাণে এমনি হা-হা রব উঠে? কেমনে নিদারুণ বিরহ-ব্যথার শান্তি হয়। ধনপ্রাপ্তিতে, পুত্রপরিজন-স্নেহে, প্রতিষ্ঠা-লাভে ত শান্তি পাওয়া যায় না! সাংসারিক ভোগ-মাত্রই কি দিবারাত্রির ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল?

নির্ম্মলা-মা বলিয়াছেন, "এমন ধনে ধনী হওয়া আবশ্যক যার ক্ষয় নাই, যা পেলে সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। সে ধন একমাত্র ভগবান্, যিনি সকলের হৃদয়ে থেকেও অপরিচিত আছেন। সৎকর্ম্মাদির দ্বারা চিত্তের অন্ধকার ও মলিনতা দূর হ'লে পরমসুন্দরের মোহন রূপ আপনা হতেই ফুটে ওঠে এবং চিত্তে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে।

তিনি হৃদয়ে না জাগলে শান্তি পাওয়া যায় না। সংসারী আমরা, যেই দুই পয়সার আয়ের পথ হ'ল, অমনি ঘরবাড়ী, খাওয়া-দাওয়া, আত্মীয়-স্বজন লয়ে আমোদ, পুত্র-কন্যা-পালনে সুখ, কত অলীক আনন্দে কাটে দিন! বয়সের ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে শোক-তাপের তাড়নায়, অভাব-অভিযোগের পীড়নে প্রাণ নিরানন্দময় হয়ে ওঠে। সুখ-দুঃখ সদাই মানবের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যাঁরা সকল কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করতে পারেন, তাঁরাই জীবনের শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও শান্তি পান।"

জগতে সবই ভগবানের ইচ্ছা-শক্তির ফল, প্রবাহের ন্যায় যখন দুঃখ আসে নির্ব্বিচারে তাঁরই দান বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে

পারিলে, দুঃখের ভিতরেও আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়। এ বড় কঠিন সাধনা; তাহা যে মানব পারে তার কর্ম্ম সার্থক হয়, সেই কর্ম্মী দৈবশক্তির অধিকারী হয়। সৎকর্ম্ম, সৎসঙ্গ, সদালাপ এবং সৎশাস্ত্র-পাঠের অভ্যাসেই মানব সদ্‌বৃত্তির অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়। অভ্যাসই স্বভাবে পরিণত হইয়া চিত্তে কোন বিজাতীয় বৃত্তির প্রকাশ হইতে দেয় না। তখনই চিত্ত নির্ম্মল হয়, ভেদাভেদ-জ্ঞান আর থাকে না। মনে রাখা চাই—

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন,
বিশ্বাস পরমাত্মীয়, নির্ব্বাণ পরম সুখ।

যেখানে জন্মের আনন্দ, সেখানেই মৃত্যুর শোকাশ্রু বহে। মানুষের জন্ম অনিশ্চিত, তবে 'জন্মিলে মরিতে হবে'—ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু অকাল-মৃত্যুর জন্যই মানব-হৃদয়ে ব্যথার ঢেউ তীব্রতর হয়। না গড়িলে ভাঙ্গে না, আবার না ভাঙ্গিলেও গড়ে না,—ভাঙ্গা-গড়ার চক্র বিশ্বে চিরকাল ঘুরিতেছে। পুত্রকন্যা লাভ করিয়া আমরা হাসি, আবার তাদের হারাইয়া কাঁদি। ইহাই কালের গতি—তিনিই মহাকালরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত। তিনি অখণ্ডরূপে পূর্ণ, আবার খণ্ডরূপেও পূর্ণ। তিনি সুখে-দুঃখে সমভাবে বিরাজ করেন। তিনি মঙ্গলময়!

এ তত্ত্ব জানা থাকিলেও কেন সন্তানের বিরহ-ব্যথা প্রাণে এত জ্বালা দেয়। কোন শাস্ত্রবচন, কোন কেতাবী নীতিকথা, কোন সাধুসঙ্গ বিরহ-তাপানলে শান্তিবারি সেচন করিতে পারে না। প্রাণ শূন্যতায় ভরিয়া থাকে, বিষাদে চিত্ত ম্রিয়মাণ হয়, জীবনের মমতা হ্রাস পায়, শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, আশা ম্লান হইয়া পড়ে।

আত্মার বিনাশ নাই, জন্মাইলেই এ দেহের বিনাশ,—গীতায় ইহাই বুঝাইয়াছেন শ্রীভগবান্ স্বয়ং। তিনি বলিয়াছেন,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

যখন মানব-দেহ জরা ও বার্দ্ধক্যে ক্লিষ্ট হয়, তখন আত্মসুখ লাভ করিবার জন্য জীবাত্মা নবকলেবর গ্রহণ করে। সে পরিবর্ত্তনে বা মরণে শোক করা অকর্ত্তব্য—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁর সে নিয়মের পালন হয় কোথায়? সুস্থ, সবল, দিব্যকান্তি-দেহ, যাদের প্রাণে কোন কুটিলতা প্রকাশ পায় নাই, যাদের চিত্ত নির্ম্মল, হৃদয়ে কোনরূপ পাপের পঙ্কিল-প্রবাহ নাই, এরূপ মাধুর্য্যময়ী বালিকাদের দেহ-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কেন হইল, তাহা এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিবার শক্তি নাই।

"ইহা পরমাত্মারই লীলা"—বলিয়া শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় দিনের পর দিন কত প্রবোধ দিলেন, মন কিন্তু প্রবোধ মানে না, অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ হয় না। প্রথম বজ্রাঘাতের ভীষণ জ্বালা নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই আবার সন্তান-বিরহের নিদারুণ ব্যথা বাজিল, জ্ঞান হারাইলাম। এবার সুরেন্দ্রনাথও কোন প্রবোধ দিতে পারিলেন না—কাতরতা দেখিয়া নিজেই কাঁদিলেন।

হরিদ্বার হইতে মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মোহন্ত মহারাজ আসিয়া বলিলেন, "ইহা তাঁর করুণা ব্যতীত আর কিছু নহে, তাঁর সেবায় মন দিবার আহ্বান, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা আর জগতের নিয়ম।" মন এ প্রবোধেও শান্তি পাইল না। অবশ্য 'তাড়না সেই করে যে মঙ্গলের ক্ষমতা ধরে।' অবলা,

সরলা, নির্ম্মলা দুইটি বালিকার প্রাণ হরণ করিয়া তাঁর কি কাজ সাধিত হইল, তাহা বুঝিতে পারা অসাধ্য।

ব্যথায় মানুষ যেমন কাতর হয়, তেমনি আবার সেই কাতরতা সহ্য করিতে বাধ্য হয়। শূন্যতা, অভাব, বিরহ, ব্যথার জ্বালায় মানব অহরহঃ জর্জ্জরিত। যে ব্যথা পায়, সেই ব্যথার জ্বালা জানে, অন্যে তার তীব্রতা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারে না। স্বজন-বিয়োগে ধনী, মানী, জ্ঞানী—সকল মানবই চিরদিন শোক করিয়া থাকে। তবে কর্ম্মে ও মোহে পড়িয়া মানব সেই শোকও চাপিয়া থাকে, কর্ম্মের আবর্ত্তে ভাসিয়া যায়। প্রাণের জ্বালা কিন্তু বাহিরের সুখ-প্রলেপে কখনও নিবাবিত হয় না। শ্রীভগবানের কৃপায় মানুষ শোকের তীব্রতা চাপা দিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। ভগবানের আরাধনা সকল দুঃখে শান্তি আনে।

শান্তি পাইতে হইলে আনন্দময়ী মার 'সৎ-বাণী'র উপদেশ পালন করিতে হয় "একান্ত না হ'লে শ্রীকান্তকে পাওয়া যায় না। নীরব নির্লিপ্ত ভাবে যারা পরমপুরুষের সাধনা করতে চায়, হিমালয় তাদের পক্ষে অনুকূল স্থান বটে। চারিদিক্ গম্ভীর, প্রশান্ত, সৌন্দর্য্যময়! এর ক্রোড়ে 'বসে' অনন্তের চিন্তা বা আত্মবিচার স্বভাবতঃই সহজ। আবার ভাবকে লক্ষ্য করে' যার সাধনা, সমুদ্রতীর তার উপযোগী। তরঙ্গে তরঙ্গে ভাবের হিল্লোল এসে ভাবময়ের সীমাতীত ভাবে ডুবিয়ে দেয়; পরম লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। গৃহীর পক্ষে গৃহেও ঈশ্বরচিন্তার স্থান আছে। যে ভগবৎপ্রেমে সর্ব্বত্যাগী, যার চোখে ভগবান্ সর্ব্বময়, তার স্থান সর্ব্বত্রই। মনকে নিয়মিত করে' সকল অবস্থার উপরে তুললে, স্থান-অস্থানের দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। তা না হ'লে সন্ন্যাসী হয়ে বনেই যাও, গিরিকন্দরেই বাস কর,—কিছুতেই কিছু হবে না।

সেই সন্ন্যাসী—যার সদা শূন্যে বাস, যার নিকট সবই শূন্য। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে' অপরের মুখের দিকে নিত্য তাকিয়ে থাকা কি সন্ন্যাসীর রীতি? যতক্ষণ ঘরবাড়ী, ট্যাঁকে পয়সা, শরীরে শক্তি, মনে ভোগবাসনা, প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসার লালসা থাকবে ততক্ষণ গৃহেই থাকা উচিত। সন্ন্যাসীর ভাব লয়ে গৃহী হওয়া খুবই প্রশংসনীয়; সন্ন্যাসীর ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন না করে' শুধু ভেক নিয়ে বেড়ানো একটা বড অপরাধ।"

শ্রীমার নিজ মুখ হইতে শুনিলাম, "সমুদ্রের স্বভাব স্থির, গভীর, অসীম, ক্রিয়া আরম্ভ হ'লেই তরঙ্গ ওঠে, তাতেই অভাব সৃষ্টি করে, ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হয়। স্বভাবই সত্য, জগতে আর সব মিথ্যা!"

কেবল অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে সাধন-ভজনের স্থিরতা আসে না। ভাবহীন অনুষ্ঠান প্রকৃত ধর্ম্মের সহায়ক হয় না। তপস্যা মানে—তাপ সহ্য করা। ত্রিতাপের জ্বালার চেয়েও বেশী তাপিত না হইলে তপস্যা হয় না। প্রথমে সকল ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ সংযম চাই। যত দিন অপূর্ণতার লেশ থাকিবে, তত দিন পূর্ণের দর্শন পাওয়া কঠিন। যাঁর ইঙ্গিতে জগৎ চলিতেছে তাঁর দিকেই সব সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে বিষয়ভোগের তৃষা আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। ভগবানের শরণাগত জনের মমত্ব-বুদ্ধি হালকা হয় এবং বিপদে ধৈর্য্য-ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। হে দয়াময়! সে শক্তি দাও।

জানি, সংসারের রূপ-রসাদির ভোগে ক্ষণিক সুখ পাওয়া যায়,--সে তৃপ্তি আপাতমধুর, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মানবকে ছুটায়। তাহাতে মানব প্রকৃত আনন্দ পায় না। সংসারের খণ্ড খণ্ড আনন্দ মনকে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে

পারে না। চাই পূর্ণানন্দের আস্বাদ। সেই আনন্দ অন্তরের অন্তস্তল হইতে উঠে। সে আনন্দ এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না; সেই আনন্দই পূর্ণ, সত্য ও নিত্য—যাহার আস্বাদেই পরম শান্তি!

পরম সত্যকে লাভ করিতে হইলে, প্রাণে শান্তি পাইতে হইলে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সারনাথের মহিলা-বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাত্রী মালিনীর বাণী মনে রাখিয়া জীবন কাটাইতে হইবে:

সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল,
অসন্তোষ যত কিছু অসুখের মূল।
অন্ত কভু নাহি জানি দুরন্ত পিয়াস,
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস।
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্ম্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান্,
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান।

এক ভরসা যে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরূপ। মানব-জন্ম সকল জন্মের সার। মানুষের মনোরাজ্যেই অপার মহামূল্য গুপ্ত ধনরত্ন নিহিত আছে। তাই মানব অন্তরের জ্বালা চাপিয়া শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতে প্রাণ-মন নিয়োগ করে,—ত্যাগ ও সাধনার দ্বারা বিশ্বকে উজ্জ্বল করে। তারাই জীবের উপকার করে, পরম পুরুষের করুণা পায়। তাদেরই চিত্ত একমুখী হইয়া বাহির-ভিতর এক করিয়া দেয়। সব ভেদাভেদ ঘুচিয়া যায়, তখনই মানব চিরশান্তি পায়।

দাও দেব, প্রাণে সেই বল! দাও প্রভু, হৃদে সেই ভক্তি!! দাও মা, সাধনায় সেই শক্তি!!!

স্মৃতি

জীবনে কতই না ব্যথা পাইতে হইতেছে। কতই না বিপদের বোঝা বহিতে হইতেছে। প্রথম গুরুতর ব্যথা পাইলাম ১৩২১ সালে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ পিতৃবিয়োগে। বয়স তখন পঁচিশ, নিজের পায়ে ভর দিয়া সবে দাঁড়াইতেছি। পিতৃদেব গোপালচন্দ্র ঘোষ হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি ছিলেন পূর্ত্ত-বিভাগের স্থপতি (এঞ্জিনীয়ার), দেহ সুগঠিত, স্বাস্থ্য অটুট, দিব্যকান্তি, পূতচরিত্র। তাঁর অকস্মাৎ তিরোধানে ছয় ভ্রাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীকে লইয়া অকূলে পড়িলাম।

প্রথম শিশু কুন্তীর জন্ম হয় ১৩২০ সালের ১৩ই কার্ত্তিক। বংশের প্রথম সন্তান বলিয়া পিতামহের পরম আদরণীয়া হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে পিতামহ পৌত্রীর অন্নপ্রাশন আমোদ-প্রমোদে, সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

১৩২৪ সালের ১৫ই পৌষ রাত্রে পাইলাম আবার দারুণ ব্যথা পত্নী শৈলবালার বিয়োগে। এ ব্যথা যেমন নিদারুণ তেমনি আকস্মিক। সে সময় কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল কলিকাতায়, ডক্টর অ্যানি বেশাণ্ট্ ছিলেন সভানেত্রী। মান্দ্রাজী প্রতিনিধিদের আবাস হইয়াছিল মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের গৃহে। প্রতিনিধিদের আহারাদির ব্যবস্থার ভার লইয়া সপ্তাহকাল দিবারাত্রি সেই স্থানেই কাটাইতে হইল। বাটীর সংবাদ রাখিবার অবসর পাই নাই। আসন্নপ্রসবা স্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর ভ্রাতার আলয়ে, শুঁড়ায়। ১৫ই পৌষ রাত্রি ১২টার সময় দেবেন্দ্র আমাকে

৩

ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম প্রাণপ্রিয়ার প্রাণহীন দেহ। আর দেখিলাম রোরুদ্যমান দুইটি শিশুর নিরাশপূর্ণ দৃষ্টি। প্রাণ হা হা করিয়া উঠিল। ধৈর্য্য হারাইলাম। কি নিষ্ঠুর আমি, শেষ সময় নিকটে রহিলাম না, শেষ কথাও শুনিতে পাইলাম না। না জানি দেখিবার তরে, প্রাণের শেষ কথা বলিবার তরে তাঁর প্রাণ কতই না ব্যাকুল হইয়াছিল। শিশু-কন্যা দুইটির ভার দিবার জন্য কতই না তাঁর প্রাণ আকুল হইয়াছিল। হয়ত সেই অভিমানে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। বড়ই ব্যথা বাজিল প্রাণে। ব্যথার জ্বালা হ্রাস করিতে দীর্ঘ সাত বৎসর চিত্তের সহিত কত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মানব আমি, নিষ্ঠুর আমি, পাপী আমি—সে তাপও সহ্য করিলাম। আবার হাসিলাম, আবার খেলিলাম, ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিপ্রায় রাখিলাম চাপিয়া সে ব্যথা।

আমার ব্যথায় সান্ত্বনা দিতে তখন তপস্বিনী অ্যানি বেশাণ্ট্ বলিয়াছিলেন, "It is destined, the result of your own *Karma*. You are fortunate! This will lead you to a step farther. Please, do not allow yourself to be over-powered" তখন ছিলাম আমি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর গুহ্য চক্রের (inner circle) সভ্য; তাই মনকে প্রবোধ দিলাম ইহাই হয়ত সত্য।

সেই অব্যক্ত বেদনার স্মৃতি-কণা দুইটি বুকে লইয়া ব্যথিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম। কুন্তীর বয়স তখন তিন, উমারাণী মাত্র এক বছরের। আঠার বছর সেই মাতৃহীনা শিশুদের শাবকের মতন বুকে-পীঠে করিয়া লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত করিলাম। বছরের পর বছর এক দিকে অন্নসংস্থানের জন্য উদয়-অস্ত স্থপতির কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অন্য দিকে শূন্য গৃহে শিশু-

পালন। স্বহস্তে শিশুদের দুগ্ধপান, স্নান, আহার, বেশ-পরিবর্ত্তন, ঘুমপাড়ানো—সমস্তই করিতে হইত। সে দুইটিকে বাঁদর-ছানার মত

ডক্টর অ্যানি বেশান্ট্

ঘাড়ে-পীঠে বহন করিয়া দেশ-বিদেশে বেড়াইতে হইত। মনে বৈরাগ্য, আর হাতে কাজ। না ছিল বিরাম, না পাইতাম শান্তি!

শিশুরা বড় হইল। শিক্ষার ব্যবস্থা করিলাম। পল্লীতে তখন ভাল বালিকা-বিদ্যালয়ের অভাব। ২৯, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে হিন্দু বিধবাদের ট্রেনিং দিবার জন্য সরকার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে ছিল একটি নিম্নপ্রাইমারী স্কুল। শ্রীযুক্তা সরলা মিত্র ছিলেন তার অধিনায়িকা। কুন্তীকে প্রাথমিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য দিলাম সেখানে ভর্ত্তি করিয়া। পর বৎসর উমাও যাইল সেই স্কুলে।

শ্রীযুক্তা সরলা রায়

১৯২০ সালে ভবানীপুরে অন্নদা ব্যানার্জ্জির লেনে মিসেস্ পি. কে. রায় স্থাপনা করিলেন গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল, নব প্রথায় শিক্ষা প্রদান হয় সে বিদ্যালয়ে। কুন্তীকে দিলাম সেই স্কুলে। শেষ পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছিল সেই স্কুলে। সহপাঠিনী ও শিক্ষয়িত্রীদের ভালবাসা ও স্নেহ পাইয়াছিল সে বরাবর।

কয়েকটি সহপাঠিনী তার কুন্তী নাম বিকৃত করিয়া ডাকিত তাকে 'খুন্তি' বলিয়া। লজ্জিত হইত সরলা-বালিকা। তার ম্লান মুখ দেখিয়া সদাশয়া শিক্ষয়িত্রী বদলাইয়া তার নাম রাখিলেন 'নিশারাণী'। তার স্বাস্থ্য সকল সময় ছিল অটুট। এক দিনও তার ছিল না স্কুলে অনুপস্থিতি। প্রতি বৎসরই রেগুলার এটেণ্ডেন্সের প্রাইজটি সে পাইত। সরল ছিল তার প্রাণ, হাস্যময় ছিল তার গতি, সেই জন্য লেডী আরউইন দিয়াছিলেন তাকে Livelinessএর জন্য বিশেষ পুরস্কার। করিয়াছিলেন তাকে একদিন আদর লেডী লীটন পারিতোষিক-সভায়। এই গোখ্‌লে স্কুল হইতেই ১৯৩১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় হইয়াছিল সে উত্তীর্ণ।

গোখ্‌লে স্কুলের হিতার্থ গ্লোব ও এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দুইবার হইয়াছিল অভিনয়। অভিনয় করিয়া পাইয়াছিল নিশা কত সুনাম। গোখ্‌লে স্কুলের ছাত্রীরা সকলেই অভিজাত বংশের, তাদের বেশ-ভূষা, চাল-চলন সবই উচ্চাঙ্গের। কিন্তু এ আবহাওয়াতেও নিশা কখন বিলাসিতার মোহে পড়ে নাই। তার জন্য কখনও তার পিতাকে উৎপীড়িত হইতে হয় নাই। সদাই পরিচ্ছন্ন মনোহারী বেশ সে পরিত বটে, কিন্তু কখনও তাতে আড়ম্বরের লেশমাত্র থাকিত না। সদাই নিজ বেশ স্বহস্তে পরিষ্কার করিত। একদা আমার নিকট প্রস্তাব করে, বছরে যে কয়খানা সাড়ী ও ব্লাউজ আমি কিনিয়া দিব সেগুলি সব যদি সে একবারে পায়, তাহলে গুছাইয়া হিসাব করিয়া প্রতি সপ্তাহে পর পর বদলাইয়া সেগুলি সে পরিতে পারে। এ ব্যবস্থায় নূতনত্বের মহিমা রক্ষিত হয়, আর মিতব্যয়িতাও ক্ষুণ্ণ হয় না। সে জীবনে কখন বিলাসিতায় অমিতব্যয়ী হয় নাই।

নিশারাণী ওস্তাদের নিকট কণ্ঠ-সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া সুগায়িকা হইয়াছিল। রজনী সেনের "বধির যবনিকা," রবীন্দ্রনাথের "হাতে ছিল হাসির ফুলের হার," ডি এল রায়ের "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে" ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীত "নাচত মোহন নন্দদুলাল" প্রভৃতি গানগুলি গাহিয়া সে শ্রোতাদের মুগ্ধ করিত। সঙ্গীত-সম্মিলনীতে বহু বৎসর শিক্ষা পাইয়া সেতার-বাদ্যে সে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। সঙ্গীত-সম্মিলনীর সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরী তাকে খুবই স্নেহ করিতেন। সেতার-বাদ্যের জন্য সে পারিতোষিক পাইয়াছিল এবং সম্মিলনীর জল্‌সায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল।

সাহিত্য-সাধনায় ছিল তার অপার আনন্দ। কখনও কোন উপন্যাস সে পাঠ করে নাই। কাব্য, ইতিহাস, জীবনী-পাঠেই অপার আনন্দ পাইত। ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন-উপলক্ষে তার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া কামিনী রায় মহোদয়া ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দিনের পর দিন তার সাহায্য না পাইলে সম্মিলনের অধিবেশনে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কা ছিল।

কামিনী রায়

দেশ-ভ্রমণে তার ছিল প্রবল আগ্রহ। শৈশব হইতেই বহু দেশ সে পিতার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিল। কাশীর প্রতি দেবালয় ও বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শনে এবং গঙ্গাস্নানে বড়ই আনন্দ পাইত। পুরী, কণারক, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরির স্থপতি-দর্শনে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কতই তৃপ্তি পাইত। তারই
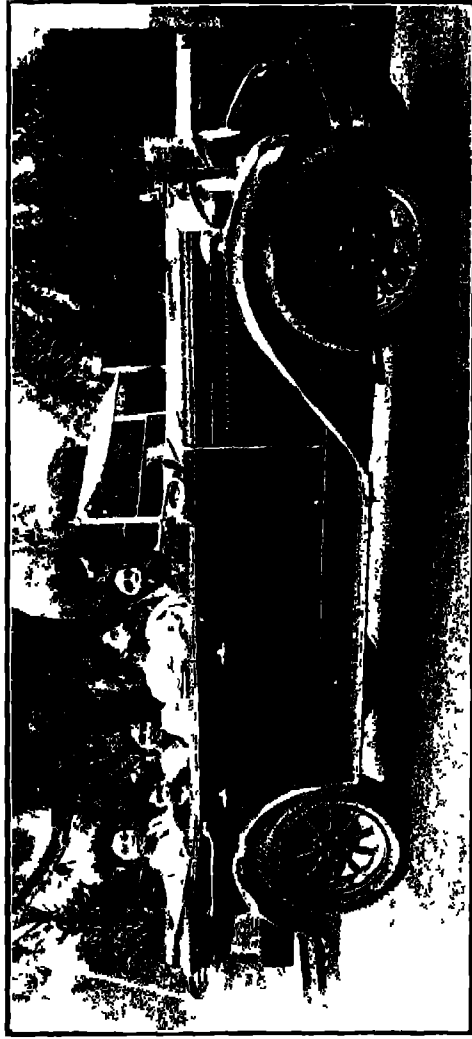
গয়ার পথে মোটরে নিশা ও উমা

আগ্রহে একবার সপরিবার মোটর গাড়ীতে কাশী যাওয়া হয়। হাজারীবাগের পথে প্রভাতী সৌন্দর্য্যে ও ফুল্লকুসুমিত বনস্পতির সৌগন্ধে সে কত অপার আনন্দ পাইয়াছিল। প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানে কতই সে প্রফুল্ল হইত। আগ্রা-দিল্লী, মথুরা-বৃন্দাবনের শিল্প-সম্ভার-দর্শনে মোহিত হইয়া কত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল। ঘাটশীলা ও শিমুলতলা-ভ্রমণে সে যে কত আনন্দ পাইত তা তার পত্রের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

১৩৩১ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ, যে দিন স্যর আশুতোষের অন্ত্যেষ্টি

গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত

ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, শ্রদ্ধেয়া মহিলা-কবি গিরীন্দ্রমোহিনী মহাপুরুষের নশ্বর দেহাবসান দেখিবার জন্য সে দিন মহাশ্মশান কেওড়াতলায় গিয়াছিলেন। বিপুল জনতার মধ্য দিয়া তাঁর শবের নিকট

যাওয়া ঐ বৃদ্ধার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী আশুতোষের মৃতদেহ দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কোন উপায় করিবার জন্য বার বার আমায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহীশূর-রাজ-স্মৃতিমন্দিরের ঘাট দিয়া নামিয়া গঙ্গাগর্ভে হাঁটিয়া গিয়া চিতার উপর স্যর আশুতোষের

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নশ্বর দেহ দেখাইবার ব্যবস্থা করিলাম। কুন্তীরাণীরও স্যর আশুতোষের শব দেখিবার আগ্রহ প্রবল ছিল, বৃদ্ধা মহিলা-কবির হাত ধরিয়া বালিকা হাঁটুভোর জল ভাঙ্গিয়া অতিকষ্টে তাঁর সঙ্গে শবের নিকট উপস্থিত হয়। মহাপুরুষকে শেষবার দর্শন করিয়া যেমন ধন্যা হইয়াছিল, তেমনি সরলা বালিকার প্রাণে বড়ই

বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী পিতা-পুত্রীকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। কোথায় গেল ভাসিয়া সেই সব প্রীতি-কথা!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ম্মবীর শ্রীযুত অমল হোম মহাশয় রবীন্দ্র-জয়ন্তীর প্রধান সংবর্দ্ধনা-উৎসবে কবিবরকে বরণ করিবার এবং বরণ- ও অর্ঘ্য-ডালা সাজাইবার যাবতীয় ভার উমা-কুন্তীর উপরই ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

মাতৃহীনা কন্যাদের বিবাহ স্থির করা বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কত যে রজনী চিন্তায় ও অনিদ্রায় কাটিয়াছে তা গোনা যায় না। ভগবানের করুণা না পাইলে জগতে কিছুই হয় না। নানা চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইত তখন কতই ব্যথা লাগিত প্রাণে। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বিলাত হইতেই একটি পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে দিয়া তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কুন্তীর বিবাহ স্থির করেন। স্যর দেবপ্রসাদও তাকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হন। কিন্তু যখন সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল কত ব্যথাই না পাইলাম।

অবশেষে কলিকাতার এক বিশিষ্ট বংশে ১৩৩৯ সালের ১লা ফাল্গুন নিশারাণীর বিবাহ হয়। কলিকাতার পুলিশকোর্টের বিখ্যাত উকীল কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এটর্নী শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার দত্তের সহিত নিশারাণীর শুভ পরিণয় হয়। এ বিবাহ-বাসরে বাঙ্গলার বহু সুধী ও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি নিশারাণীকে শুভ আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করিয়াছিলেন। আশীর্মালার অনুলিপিই এ কথার প্রমাণ।

হায়! মহাজনগণের সে সব শুভেচ্ছা নিশারাণীকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না। তবে গুরুজনের আশীর্ব্বাদের বলে নিশারাণী অল্প সময়ের মধ্যে শ্বশুরালয়ে সর্ব্বজনের প্রীতি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল। অল্প সময়েই তার সরলতা ও সেবায়

শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্যান্য পরিজন সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শাশুড়ীর স্নেহ-যত্নেই নিশারাণীর দেহকান্তি ও মনের আনন্দোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে নিশার জননী যেমন হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তেমনি এ সোণার প্রতিমাও তার সোণার সংসার সাজাইয়া রাখিয়া অকস্মাৎ অমরধামে চলিয়া গেল! তখন ছিল ব্যথার যাতনা সহ্য করিবার ক্ষমতা,—এখন না আছে শক্তি, না আছে মনের দৃঢ়তা, না আছে কোন আশা!

১৩৪২ সালের ২০এ ভাদ্র প্রাতে ৭টার সময় টেলিফোনে জানিলাম, নিশারাণী নির্ব্বিঘ্নে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। আনন্দে চিত্ত ভরিয়া গেল, ছুটিলাম দৌহিত্র-দর্শনে। হায়! হরিষে বিষাদ! দেখিলাম—ডাক্তারের ভীড, সকলের মুখে বিষাদের ছায়া। দৌড়াইয়া যাইতে ছিলাম মা নিশার কাছে, বাধা দিলেন ডাক্তার।—যাতনায় তার শরীর অবসন্ন, হৃদ্‌ক্রিয়ার গতি অতি মৃদু, পরমাত্মীয়ের সহিত হঠাৎ দর্শনে ক্ষতির সম্ভাবনা। মঙ্গল কামনায় আবেগ রুদ্ধ করিয়া এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। অক্‌সিজেনের আধার আসিল, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না। ছুটিলাম দেখিতে মা কুন্তীকে। আমায় দেখিয়া কি আনন্দ তার; বলিল, "বাবা এসেছ। বস।" শুধাইলাম, "কি যাতনা মা?" মুখে বলিল, "কিছু না," কেবল বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। কত ভরসা দিলাম, বলিলাম—শীঘ্রই আরাম হইবে। কাতর নয়নে সে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "হব বাবা?" চাহিল সস্নেহে সদ্যোজাত পুত্র পানে। অশ্রু গড়াইল দুই নয়নে। প্রাণ গেল আমার ফাটিয়া! আবেগ রুদ্ধ করিয়া দিলাম সান্ত্বনা। ক্ষণেকের জন্য সে একটু সুস্থ বোধ করিল। উমারাণী আসিল, তাকে

নির্নিমিষে দেখিতে লাগিল; বলিল, "ঠাকুমা, সেজ কাকীমা?" বলিলাম, আনিতে পাঠাইতেছি।

আবার দারুণ যাতনা, ছটফট করিতে লাগিল; ছোট দেবর সুধীর—ডাক্তার। তাকে ডাকিয়া বলিল, "বাঁচাও।" শাশুড়ীকে বলিল, "কত অপরাধ করেছি, ক্ষমা করবেন।" শাশুড়ী কত আদর করিলেন, বলিলেন, "তুমি ত মা আমার লক্ষ্মী!"

ইঙ্গিতে স্বামীকে ডাকিতে বলিল। স্বামী নিকটে বসিলে তার হাত দু'টি লইয়া বলিল, "ক্ষমা করো। বালিসের তলায় চাবি আছে।" চোখের জল ঝরিতে লাগিল, শিশুটিকে দেখাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দেখো!" পূর্ব্বরাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত সুস্থ দেহ-মনে সংসারের কাজ করিয়াছে, ধোপার কাপড়ের হিসাব করিয়াছে, আলমারী গুছাইয়াছে, বেণী বন্ধন করিয়াছে। আহা! জানিত না বালিকা, প্রাতে তার সব লীলাখেলা, সব আশাভরসা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। ওঃ! কি নিদারুণ দৃশ্য!

আবার ছটফট করিতে লাগিল; "বাবা, বাবা" বলিয়া কাতরাইতে লাগিল। আর পারিল না সহ্য করিতে যাতনা, নেতাইয়া পড়িল আমারই ক্রোড়ে! ভগবান্‌কে কত ডাকিলাম, কত কাতর নিবেদন তাঁর চরণে জানাইলাম। পাপী আমি, দীন আমি—আমার কাতর প্রার্থনা তাঁর কাছে পৌঁছিল না।

হাহাকারের রোল উঠিল! নিস্তব্ধ আমি। মা কুন্তীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া নির্নিমিষে দেখিতে লাগিলাম তার অন্তিম দৃষ্টি! কি মহতী, কি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি!! নিবিল দীপশিখা ধীরে ধীরে!!!

যাও কুন্তি, সেই অনন্ত সুখধামে! লও শান্তি পরম পিতার ক্রোড়ে! সাধ্বী তুমি! দেবী তুমি!

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ!

অশ্রু

জন্ম তার হইয়াছিল ১৩২২ সালের ১৯এ আষাঢ। কন্যার পর কন্যা জন্মগ্রহণ করায় পাইয়াছিল অনাদর! তার জননীরও হইয়াছিল অভিমান! তাই বোঝা চাপাইয়া আমার ঘাড়ে অকস্মাৎ চলিয়া গেল দেবী ১৩২৪ সালের ১৫ই পৌষ! প্রাণ গেল ভরিয়া হাহাকারে, চক্ষু দেখিল চারি দিক্ অন্ধকার, বিষাদে ঘিরিল সারা মন, চলিয়া গেল দূরে উদ্যম! বক্ষে করিয়া আনিলাম স্মৃতি-কণা দু'টি! ধরিলাম ধৈর্য্য তাদের পালনের জন্য। সাজিলাম জননী, করিলাম পালন মার মতন, খাওয়াইলাম দুধ ঝিনুক দিয়া নারীর মতন, পালিলাম দিনরাত স্বহস্তে, পূরাইলাম তাদের সাধ আঠার বৎসর ধরিয়া যথাসাধ্য, কিন্তু হায় সব হইল বৃথা। তার প্রাণের বেদনা না বুঝিলাম ইঙ্গিতে, না পারিলাম ঢাকিয়া রাখিতে অপার স্নেহে ও যত্নে। দুঃখিনী মানিত না বটে কিছু দুঃখ, সহিত সব কষ্ট অম্লান বদনে, রাখিত না মনে কোন তাডনার তীব্রতা, সকলেরে করিত আপন—মাতৃস্নেহের অভাব পূরণ করিবার আশে। তথাপি পারিল না সহ্য করিতে এ জগতের ক্লেশ! শান্তি-আশে চলিয়া গেল পরম মাতার কোলে, আমাকে নিদারুণ শোক-সাগরে ডুবাইয়া।

পেয়েছিল উমারাণী শিক্ষা নানা বিদ্যালয়ে—গোখলে মেমোরিয়াল, স্যর রমেশ মিত্র, উনাইটেড্ মিশন ও নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অর্জ্জন করিয়াছিল নিপুণতা সেতার বাজনায় ও

নানা শিল্পকার্য্যে। চমৎকৃত করিয়াছিল সকলকে চামড়ার ব্যাগ-নির্ম্মাণে। ছিল তার কত আগ্রহ নানা বিদ্যা শিখিতে। পূরিল না কিছুই আশা তার।

শিশুকাল হইতে ছিল উমা মোর সংসারের সহায়। কাশীধাম-বাসকালে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা উমার সুগৃহিণীপনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল কত অতিথি! উমার প্রাণ ছিল সরল, উদার ও স্নেহে ভরা, পরদুঃখে সতই হইত কাতর। সেবায় করিত সকলকে তুষ্ট, দরদে করিত পরকে আপন অতি অল্প সময়ে। উমার সঙ্গে একবার ব্যবহারে হইত লোক মুগ্ধ তার সরলতায় ও আত্মীয়তায়। জগদ্ধাত্রী-পূজায়, দিদির বিবাহে, নানা অনুষ্ঠান ও উৎসবে উমা হইত কর্ত্রী, তার সুবুদ্ধি ও সতর্কতায় হইতাম চমৎকৃত।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের কলিকাতার অধিবেশনে মহিলা-প্রতিনিধিদের পরিচর্য্যা করিয়াছিল সপ্তাহকাল। হইয়াছিল সকলে তুষ্ট উমারাণীর সেবায়, তার সরল প্রাণে। কতই আক্ষেপ করিয়াছিলেন প্রবাসী মহিলা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী শুনিয়া উমার মরণ। পাইয়াছিল আশীর্ব্বাদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ মনীষিগণের।

সে ত ছিল না আমার কন্যা,—সে সাধিত সকল কাজ পুত্রের মতন। তার কার্য্যদক্ষতায় বুঝিতে পারি নাই এক দিনও পুত্রের অভাব। সে যে আমায় ঢাকিয়া রাখিয়াছিল স্নেহে ও দরদে। হায়! কি অসহায় অবস্থায় রাখিয়া যাইল উমা আমায়!

মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে পেল ব্যথা কোমল প্রাণে আজীবন

সাথী দিদির মরণে। চাপিয়াছিল নিজ প্রাণের বেদনা—পিতার শোকে দিতে প্রলেপ। হায়! কত দিত সান্ত্বনা বিজ্ঞ মার মতন, যখন পিতা হইতেন অধীর দিদির বিরহে! বলিত, 'ধর ধৈর্য্য বাবা! আছি ত আমরা, যা'ব না তোমা ছাড়ি কখন। তোমার আছে ত বিশ্বাস শ্রীগোবিন্দ-চরণে। সুখী দিদি আমার—সাধ্বী সে যে ছিল, সরল যে ছিল তার প্রাণ, নির্ম্মল যে ছিল তার মন, ভগবানে ছিল যে তার মতি! তাই শ্রীহরি নিয়েছে তাকে দিতে শান্তি! কেন মিছে কাঁদ তুমি বাবা, আসিবে না ফিরে দিদি আমার আর! তোমার ক্রন্দনে হয়ত হবে আকুল।'

কিন্তু হায়! নিজে পারিল না সহিতে দিদির বিরহ, ধরিল ঘুণ তার সবল, সুস্থ দেহে,—লইল শয্যা পক্ষকালের মধ্যে! কত-না হইল চিকিৎসা, কত-বা করিলাম স্বহস্তে সেবা। পাইলাম কিছু আশা—দেখিয়া বেরী-বেরী রোগের গতি-রোধ। বলিলেন ডাক্তার হাওয়া-পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। সাঁওতাল পরগনাই যাওয়া ঠিক হইল, বাটী কিন্তু পাওয়া গেল না। কলিকাতায় থাকিতে এক দিনও ইচ্ছা হইল না, আশঙ্কা—কদ্ধগতি ব্যাধির বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। বাগবাজারের হরিপদ দত্ত ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্নেহ করিয়া দিলেন তাঁদের মধুপুরের সুন্দর আবাস 'লক্ষ্মীনিবাস।' যাইলাম ২রা অক্টোবর প্রাতে উমারাণী-মাকে লইয়া। রাত্রিতে বসিয়া দেখিতে লাগিল সে রেলের দুই পার্শ্বের নৈশ সৌন্দর্য্য। তার শরীর খারাপ, ভয়ে বলিলাম বহুবার নিদ্রা যাইতে। বলিল, 'চাঁদিনী রাতে বাবা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতি মনোরম দেখছি, আমার বড় ভাল লাগছে, ঘুম পেলেই শোব।' ঊষার আলোক-উদ্ভাসিত মধুপুর ষ্টেশনে নামিলাম ট্রেন হইতে, যাইলাম লক্ষ্মীনিবাসে, পূরিল আনন্দে

উমারাণীর প্রাণ—দেখিয়া বাটীর শোভা, পাইয়া গোলাপের সুবাস; পথক্লান্তি গেল দূরে। সংসার-কার্য্যে-পটু উমারাণী দুই ঘণ্টার মধ্যে সাজাইল সুনিপুণ করিয়া প্রবাসের সংসার, পাকা গৃহিণীর মতন করিল সব সুব্যবস্থা, রহিল না কিছুরই অস্বচ্ছন্দতা। ভগবানের কৃপায় সব সুবিধা পাইয়া হইলাম মোরা সুখী, পাইলাম মনে স্বস্তি। আসিল দুই দিন পরে ৺মহাষষ্ঠী, শুনিলাম মধুপুরের সার্ব্বজনীন পূজার ঢক্কানিনাদ। ভরিয়া গেল মন ও প্রাণ বিষাদে। বুঝিল উমা আমার প্রাণের বেদনা,—কুন্তীরাণীর জন্য বিরহ-বেদনা—তার উপর নিজগৃহে মা দশভুজারপূজার সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার নিদারুণ দুঃখ। বুঝাইল মা আমায় কত; ভুলাইতে মন আমার সাজিল নব বেশে। চাপিয়া রাখিল তার মনের বেদনা।

গেল দিতে অঞ্জলি দেবীপদে মোর সাথে। করিল প্রণতি, মিনতি! কে শুনিল অবলা সরলার প্রাণের আকুলতা? বিজয়ার দিনে আর পারিলাম না সহিতে কুন্তীরাণীর বিরহ-ব্যথা। কতই কাঁদিল সে আমার সহিত। দিল প্রবোধ মোরে বিজ্ঞের মতন।

দুই দিন পরে আসিল হঠাৎ তারবার্ত্তা লইয়া মাতার কঠিন পীড়ার সংবাদ। হইয়াছে উমার শরীরে উত্তাপ, তাই পারিলাম না সঙ্গে লইয়া যাইতে তারে। তাকে অসহায় অবস্থায় মধুপুরে রাখিয়া, আসিলাম ভবানীপুরে—দেখিলাম মাতার প্রাণশূন্য দেহ। দুঃখে ভরিয়া গেল চিত্ত! বিরহের উপর বিরহ! আমার স্নেহের নীড় গেল ভাঙ্গিয়া।

কালীঘাটের কেওড়াতলার মহাশ্মশানে ১৩৪২ সালের ২৩এ আশ্বিন মাতৃদেহ দিলাম ভস্ম করিয়া। আকুল প্রাণে, ব্যথা লইয়া

চলিলাম সেই রাত্রেই মধুপুরে। গভীর রাত্রে নিঃশব্দে শুইলাম; কিন্তু উমারাণীর সতর্ক চিত্ত ধরিয়া ফেলিল ঠাকুমার মৃত্যু, চাপিয়া রাখিল ব্যথা। করিল কত গল্প, লইল ঠাকুমার শেষ-সংবাদ।

প্রাতে দেখিলাম সুস্থ দেহ, করিল কত কাজ, কত গল্প—কিরণবাবুদের মেয়ে-বৌয়েদের সহিত। পর দিন আমায় হবিষ্যান্ন খাওয়াইবার জন্য কত ব্যস্ত। পাঠাইল মোরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হবিষ্যান্ন পাক করিবার ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য। আহারের সময়ে কাছে বসিয়া খাওয়াইল। হায়! মার আমার সেই শেষ পিতৃসেবা!

সেই দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কত গল্প করিয়াছিল কিরণবাবু ও তাঁর আত্মীয়ের মেয়েদের সাথে। কিরণবাবুর আত্মীয়েরা ধরিয়া বসিলেন, একদিন তাঁদের বাড়ী গিয়া আমার লক্ষ্মী-মা যেন তাঁদের দিয়ে আসেন আনন্দ। মা রাজী হইল অনুরোধ রাখিতে। হায়! জানিত না যে, প্রাতে সে যাবে চলিয়া কোন্ অজানা পথে!

রাত্রি তিনটায় ডাকিল মোরে, বলিল—শরীর-মধ্যে কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছে। করিতে লাগিল কত ছটফট। কত করিলাম যত্ন, কত ডাকিলাম বিধাতায়। ডাক্তার আসিলেন। দারুণ কাশীতে করিল মার শরীর ক্লান্ত, পারিলেন না কমাইতে ডাক্তার তার অসহ্য যাতনা।

জড়াইয়া ধরিল সে আমার কণ্ঠ, বলিল, "বাবা আর পারচ্চি না! আমায় বাঁচাও!" পাপী আমি, নিঠুর আমি—পারিলাম না রাখিতে সোণার প্রতিমায় ধরিয়া।

চাহিল পান করিতে জল। কিন্তু আচারনিষ্ঠা বালিকা করিল না পান যতক্ষণ না ছাড়িল তার অপরিচ্ছন্ন কাপড়,

লইল শ্রীভগবানের নাম। করাইলাম বেদানার রস পান, বাড়িল যাতনা, শুইল মোর ক্রোড়ে আমার কটী দুই হাতে বেষ্টন করিয়া। কিন্তু পারিল না বালা আর সহিতে মৃত্যুর তীব্র যাতনা, মোর পানে রহিল তাকাইয়া, ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল, সব শেষ হইল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল—আমি জ্ঞান হারাইলাম।

মা আমার চলিয়া গেল ২৭এ আশ্বিন, সোমবার প্রাতে ৮ ঘটিকায়! আঠার বৎসর যেমন রাখিয়াছিলাম বক্ষে ধরিয়া তেমনি বসিয়া রহিলাম ক্রোড়ে লইয়া সেই মৃত্যু-মলিন দেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আসিল প্রবাসে শ্মশান-বন্ধুরা, আসিল উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আসিল নৃপেন—ছিনাইয়া লইয়া আসিল আমায় মার নিকট হইতে। পারিলাম না আর সহিতে ব্যথা, তার যে কাঁদিবার আর কেহ নাই! দিল না মোরে যাইতে সাথে! আমি পড়িলাম অকূলে!

ভগবন্, কত আর দেবে যাতনা! কত আর ভোগাইবে কর্ম্মফল! দাও হৃদে ভক্তি! দাও প্রাণে শান্তি!

যাও মা উমা, সেই অনন্ত সুখধামে—যেখানে দ্বেষ, হিংসা, দুঃখ, যাতনা নাই! যেখানে আনন্দ চিরবিরাজিত। লও মা, শান্তি সেই পরম পিতার চরণে!

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ!

সঙ্গীত-সম্মিলনীর সভা ও ছাত্রীবৃন্দ মধ্যে উমারাণী

বিদেহী সত্তার সঙ্গে চিরমিলন

দার্জ্জিলিং

২০শে মে, ১৯৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার বিদেহী কন্যাদ্বয়ের স্মৃতিমূলক একখানা পুস্তক আপনি শীঘ্রই মুদ্রিত করিবেন, এই সংবাদে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। এই স্মৃতি কথাটির অর্থ আশা করি আপনি যথার্থভাবে অনুভব করেন। আমার এটি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকেই স্মৃতিকে বিরহের একটি অঙ্গ বলে মনে করেন। আমার মনে হয়, এটা ভ্রান্তিমূলক ভাব। দেহের মিলনের চেয়ে যদি মনের ও আত্মার মিলন বড় হয়, তবে এটা অকাট্য সত্য যে, বাহ্যিক উপস্থিতির চেয়ে মনের ও আত্মার ভিতর দিয়ে যে উপস্থিতি ও মিলন সেটি আরো বড়, আরো সত্য, আরো মধুর।
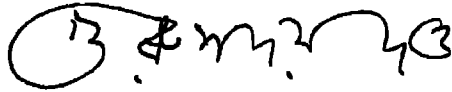
ভারতের মানুষ হয়ে, যে ভূমিতে গীতার উদাত্ত ভাব ও ছন্দের জন্ম, সে ভূমির সন্ততি হয়ে, আমরা জড় দেহের বিকারকে 'মৃত্যু' বলে আজকাল বিলাপ করি, এটিই আমার মতে আমাদের আসল পরাধীনতার ও স্বরাজ্য-লোপের লক্ষণ। আমার মনে হয় ভারতের প্রকৃত স্বরাজ্য-লাভের, প্রকৃত স্বাধীনতা- ও মুক্তি-লাভের সূচনা সে দিন আরম্ভ হবে, যে দিন ভারতের জনসাধারণ আবার ভারত-ভূমিতে অনুভূত ও

প্রকীর্ত্তিত সেই শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাবে—যাতে করে' মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাস ও অনুভব করে যে আমরা প্রত্যেকে এক একটি অমর, অবিনাশী, আত্মা—দেহের বিকার একটি জীর্ণবাস ত্যাগ করে, সূক্ষ্মতর ও উজ্জ্বলতর পরিধান বা দেহ গ্রহণ করে মাত্র। বিদেহী প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে আপন আত্মার ঘনিষ্ঠ মিলনকেই আমি যথার্থ স্মৃতি বলে মনে করি। এটি বিরহের লক্ষণ নয়—প্রকৃত ও সত্য মিলনের শাশ্বত আনন্দ-মূলক অবস্থা।

আমি কামনা করি আপনি আপনার বিদেহী কন্যাদ্বয়ের অমর ও অবিনাশী সত্তার সঙ্গে যেন চিরমিলন অনুভব করতে পারেন এবং সেই মিলনের বাণী বর্ত্তমান ভারতের আত্মবিশ্বাস-ভ্রষ্ট নরনারীর সামনে প্রকটিত করে' ভারতের মানুষকে আবার প্রকৃত আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মজ্ঞানের শক্তিতে অধিষ্ঠিত করতে সাহায্য করতে পারেন; যাতে করে' ভারতবাসী আবার প্রকৃত স্বরাজ্য- ও স্বাধীনতা-লাভ করে' বিশ্বের মানুষকে আবার ভারতের অনুভূত শাশ্বত ও অখণ্ড সত্যের শিক্ষায় দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়। ই আঃ—

জ-সো-বা!

সমবেদনা

স্বর্গীয়া নিশারাণী দত্ত

আচম্বিতে এল ডাক ! নিষ্ঠুর মরণ
না ফুটিতে ফুল-কলি করিল হরণ ;
মুকুল ঝরিয়া গেল ফলে না চুমিতে,
সতীর পবিত্র দেহ লুটাল ভূমিতে ॥

নিশারাণী দত্ত

শ্রীমতী নিশারাণীর ১৩২০ সালে ১৩ই কার্ত্তিক জন্ম হয়। ইনি ভবানীপুরের সাহিত্য- ও সমাজ-সেবক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের প্রথমা কন্যা এবং বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় জগবন্ধু বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারভাঙ্গার সিভিল সার্জ্জন স্বর্গীয় ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ বসুর দৌহিত্রী। দুই বৎসর বয়সেই মাতৃহীনা হইয়াছিলেন, শিশু অবস্থা হইতেই সরল ও পবিত্র প্রকৃতি, আজন্ম ভগবদ্-বিশ্বাসী ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই বিদ্যাশিক্ষায় প্রবল অনুরাগ ছিল। কখনও পুতুল লইয়া খেলেন নাই—খাতা-পেন্সিলই তাঁহার খেলনা ছিল। বেশভূষায় বা কোন প্রকার বিলাসিতায় কখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের পত্তন হইতেই তিনি সেখানকার ছাত্রী ছিলেন। বৎসরের মধ্যে এক দিনও স্কুলে অনুপস্থিত না হওয়াতে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। অন্যান্য বিষয়েও বহুবার পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রাক পাস করিয়াছিলেন। তৎপরেও গোখেল মেমোরিয়ালে আই এ. অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১৯৩২ সালে মার্চ্চ মাসে কলিকাতা পুলিশ-কোর্টের বিখ্যাত উকীল কৃষ্ণলাল দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার দত্ত এটর্ণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে শ্বশুর-বংশের সহিত এমন কায়মনোবাক্যে এমনি অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন যে, অল্প দিনেই তথায় প্রভূত যশ, প্রতিষ্ঠা, স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বামীর সহিত অভিন্ন আত্মা হইয়া থাকিতেন। ইহাই ভারত-নারীর, হিন্দু সতীর বিশেষত্ব ও আদর্শ।

সঙ্গীত-সম্মিলনীতে বহু বৎসর কণ্ঠ-সঙ্গীত ও সেতার-বাদ্যে

শিক্ষালাভ করিয়া ইনি গীত, বাদ্য ও অভিনয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কয়েকবার গোখেল স্কুলের ও সঙ্গীত-সম্মিলনীর সংস্রবে এম্পায়ার ও গ্লোব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহার হৃদয় সরলতায় ও করুণায় সকল সময় ভরিয়া থাকিত। ব্যথিতের দুঃখ-মোচনে সদাই ব্যস্ত থাকিতেন। দান করিলে কি ভাবে করিতেন তাহা জানাইতেন না। চুঁচুড়ার বালিকা-বাণী-মন্দিরের গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে ১০১৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিতে যাইয়া একটি রৌপ্য-পদক প্রদান করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে তিনি দুইটি সুবৃহৎ আলমারী ও বহু পুস্তক তাঁহার জননী "শৈলবালা"র স্মৃতি-রক্ষার্থ দান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতার সাহিত্য-চর্চ্চা ও নানা সমাজ-সেবার কার্য্যে তিনি পিতাকে সদাই সাহায্য করিতেন।

—"বঙ্গলক্ষ্মী," আশ্বিন, ১৩৪২

কুমারী উমারাণী ঘোষ

দুইটি ফুল প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে ঝরিয়া পড়িল। একটি ঝরিল অকস্মাৎ আচম্বিতে—যেন ঝড়ের মুখে। আর একটি অতি মনোহর, অতি নির্ম্মল—দেবার্চ্চনার জন্য কেহ যেন শত প্রহরীর মধ্য হইতে মানব-শক্তির ব্যর্থতা দেখাইবার জন্য লইয়া গেল। সকলই পরমাত্মার লীলা! বঙ্গলক্ষ্মীর বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য কেবলই এই লীলা!

গত ভাদ্র মাসে তাঁহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নিশারাণীর অকস্মাৎ তিরোধানের কথা আমরা আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশ করার অব্যবহিত পরেই, এই দারুণ আঘাত তাঁহার প্রাণে বাজিল!

উমারাণী ঘোষের জন্ম ১৩২২ সালের ১৯শে আষাঢ়। ছয় মাস বয়স কালে মাতৃহীনা হয়। পিতা জ্যোতিষবাবু তাহাকে তদবস্থা হইতে স্বহস্তে লালন-পালন করিয়া আসিতেছিলেন। এ বৎসর ম্যাট্রীক পরীক্ষা দিবার জন্য নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে সে প্রস্তুত হইতেছিল। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত পিতার নিকট ইংরাজি পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিল।

উমারাণী অতি সরল-স্বভাবা, আত্মপর-জ্ঞানরহিতা, বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মিষ্ঠা বালিকা ছিল। দেহ ছিল অতি সবল, সুঠাম ও সুস্থ। তাহার দিদির মৃত্যুর পর হইতে হঠাৎ বেরী-বেরী রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এখানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়াতে মধুপুরে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিল। এক মাসের মধ্যে জ্যেষ্ঠ

ভগিনী ও পিতামহীর মৃত্যুতে মনে দারুণ আঘাত পাইয়াছিল। পিতামহীর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে ২৭শে আশ্বিন তাহার পিতাকে দারুণ শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া মহাপ্রস্থান করিল।

উমারাণীর সহিত যে একবার কথা কহিয়াছিল বা ব্যবহার করিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে; তার সরল ও উদার প্রাণের

উমারাণী ঘোষ

কথা কেহ ভুলিতে পারে নাই। কয়েক ঘণ্টার ব্যবহারে সে পরকে অতি আপন করিয়া লইত।

উমারাণী অতি সেবানিপুণা ছিল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে মহিলা-প্রতিনিধিদের আতিথেয়তায় এই বালিকা একলা চৌরঙ্গীর প্রতিনিধি-আবাসে ক্রমান্বয়ে ছয় দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুগ্ধ করিয়াছিল।

পিতার সর্ব্বকার্য্যে, সাহিত্য ও সমাজসেবায় সে পুত্রের মত কার্য্য করিত। বঙ্গলক্ষ্মীতে আজ দুই বৎসর যাবৎ যে মহিলা-সমাচার প্রকাশিত হইতেছে তাহার প্রায় সমস্তই উমারাণীর সংগৃহীত।

শিশুকাল হইতে অতিশয় সে ভগবৎপ্রাণা ছিল। মৃত্যুর অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও প্রাতঃকালের ঈশ্বর-বন্দনা না করিয়া ঔষধ পান করে নাই। এই গুণবতী বালিকার অকাল মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি নিদারুণ। ভগবান্ তাহার শোকসন্তপ্ত পিতাকে সান্ত্বনা-দান করুণ—এই প্রার্থনা।

—"বঙ্গলক্ষ্মী," অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

OBITUARY

We deeply regret to record the death of Sreemati Nisharani Dutt, wife of Sj. Sudhansu Kumar Dutt, Attorney-at-Law, a nephew of Mr. K. L. Dutt, the well-known pleader of the Calcutta Police Court. The melancholy event took place on Friday at the residence of her husband at 180, Cornwallis Street. Sreemati Nisharani, who was only 22 years old at the time of her death, received a good education and was a great help to her father, Srijut Jyotish Chandra Ghose, Builder and Contractor of 35/10 Puddopuker Road, in his social and literary activities. We offer our sincerest condolence to the bereaved family.

—*Amrita Bazar Patrika,*
Sunday, August 25, 1935.

SAROJ NALINI DUTT MEMORIAL ASSOCIATION

Extracts from the proceedings of the meetings of the Managing Committee of the Saroj Nalini Dutt Memorial Association, held on 3rd September, and on 16th November, 1935

(1) The Managing Committee of the Saroj Nalini Dutt Memorial Association put on record their deep sense of sorrow at the sad and untimely death of a daughter of Mr Jyotish Chandra Ghose, a member of the Managing Committee of the Association, and offer their sincere condolence to the bereaved family. (3 9.35)

(2) The President referred to two further bereavements suffered by Mr. Jyotish Chandra Ghose, since the last meeting, in the death of another daughter Miss Uma Ghose and of his mother.

Resolved—that the Committee express their deep sympathy with Mr. Jyotish Chandra Ghose in his fresh bereavements.

Miss Uma Ghose's letter conveying her father's thanks to the Committee for their last message of condolence on the death of her elder sister (just a month back) was red with melancholy interest. (16.11.35.)

Dear Mr. Ghose,

I am desired by the Managing Committee of the Saroj Nalini Memorial Association to convey to you the deep regret with which they have heard of your very sad bereavement. They offer you and the members of your family their sincerest sympathy in your irreparable loss.

I take this opportunity to express to you my deep personal sympathy.

Yours very sincerely,
3.9.35.
C. C. BISWAS,
President.

60B, Mirzapore Street,
Calcutta. Nov., 19, 1935.

Dear Mr. Ghose,

The Committee of the Association have heard with very great regret of the furthur bereavements sustained by you. It was only the other day that they condoled with you in the death of your eldest daughter, and it is distressing to think that Providence should inflict these additional blows. May He give you strength and fortitude to bear up under this series of afflictions. The Committee offer you and the members of your family their deepest sympathy. Please also accept from me personally my sincerest condolences.

Yours very sincerely,
C. C. BISWAS,
President

6.12.35.

My dear Jyotish Babu,

I have been wanting long to write and tell you how grieved I am to learn of your heavy bereavements. I know human words of comfort and consolation are very vain at a time like this. That is why I was silent all this while. I now approach you and your wife with my sincerest condolences and heartfelt sympathies. May God help you to bear this crushing sorrow—the loss of three of your dearest and nearest ones in a month and give you His peace which passeth all understanding.

Yours sincerely,
NIROJ B. SHOME.

Santosh House,
1, Raja Santosh Road.

Dear Jyotish Babu,

.........I am very sorry to hear of your cruel bereavements.

Yours sincerely,
M. N. RAY CHOWDHURY.

3, Sunny Park,
Calcutta.

Dear Mr. Ghose,

.........I am very sorry to hear of your bereavements. I had not heard anything about it. All these must have been tremendous shock to you. Remain all in God's hands.

Yours sincerely,
J. Ghoshal.

58, Puddopuker Road.
Elgin Road, P.O.,
29.8.35.

My dear Jyotish Babu,

I cannot say how shocked I was to learn of your terrible bereavement—it came like a bolt from the blue. I don't know what consolation I may offer you. Inscrutable are the ways of Providence: let us try to believe, if we can, that they are the ways of love. There is nothing left for us to do except to pray to Him for His blessings and mercy and for peace to the soul of the dear, departed one

Yours in profound sympathy,
C. C. Biswas.

৺

অসিধাম, বেনারস সিটী

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,

আপনার মর্ম্মান্তিক সংবাদে একান্তরূপেই ব্যথিত হইয়াছি। মানুষের জীবনে কখন্ যে কি দিন আসে, কিছুরই স্থিরতা নাই। জানি না এ সকল আমাদের কোন্ জন্মের কোন্ মহাপাতকের ফল। অনেক ভাবিয়াছি, কোন উত্তর পাই নাই। আশা করি, আপাততঃ ভাল আছেন। ইতি—

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী—

---

২ বেলতলা রোড

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কন্যা-বিয়োগের কথা শুনে ব্যথিত হলাম। একদিন আপনার সঙ্গে এখানে এসেছিল। সে কথা মনে হচ্ছে। এ সময় আপনাদের আমাদের কীর্ত্তন শুনিয়ে শান্তি দিতে পারলে আমি কৃতার্থ হতাম, কিন্তু আমার সেই operation-এর পর থেকে শরীর মোটে ভাল থাকছে না। গাইতে সক্ষম হলেই আপনাকে জানাব। আমাদেরও ত নানা বিপদ্ হয়ে গেল। আমার ভাইএর ছোট মেয়েটি সেদিন টাইফয়েডে গেল।

আমি একটু ভাল বোধ করলেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। ইতি—

শ্রী অপর্ণা দেবী—

Bangiya Sahitya-Parishad Mandir,
243-1, Upper Circular Road, Calcutta.
The 6th December, 1935.

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সমীপেষু—

মান্যবরেষু,

আপনার ৩০এ নবেম্বরের পত্রে, আপনি যে শোক পাইয়াছেন তাহার উপর নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে—এই সংবাদে ব্যথিত হইলাম। ভগবান্ আপনাকে শান্তি দিন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আশা করি, কিছু দিনে আপনি পূর্ব্ববৎ সবল হইয়া, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কাজে আবার সহায়তা করিবেন। রমেশভবন-সম্বন্ধে আপনার দানের প্রস্তাবের অংশটি মাননীয় লেডী প্রতিমা মিত্রের গোচর করিলাম। আপনি ঐ কমিটির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

বশম্বদ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বাড়ীতে এতগুলি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আপনি বিপদে কাতর হইলে চলিবে কি করিয়া? সংসারে জন্ম ও মৃত্যু ত আমাদের হাতে না, ভগবানের বিধান বলিয়া না জানিতে পারিলে শান্তি কোথায়? একমাত্র কায করিলেই শোক ভুলিয়া থাকা যায়। আপনি ইহার মধ্যেও নারীশিক্ষা-সমিতির কথা ভাবিয়াছেন, তাহাতে সুখী হইলাম।

বিনীত

অবলা বসু

29.8 35.

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার এই দুর্ব্বহ শোকের সময়ে আপনাকে আর বিরক্ত করিব না। আপনি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। প্রার্থনা করি, ভগবান্ আপনাদিগকে এই নিদারুণ শোকের সময় চিত্তে বল দান করুন এবং আপনারা জগতের এই নিয়ম জানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। নিবেদন ইতি—

আপনার শুভানুধ্যায়ী

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুপদ-ধ্যান

ঠাকুর-পো,

তোমাকে কোন সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার জানা নাই। আমার প্রথম ও শেষ কথা তুমি শোকের আবেগে অধীর হয়ে লোকের দয়ার পাত্র হয়ো না। শুনলাম তুমি বাড়ী ঢুকতে পারনি, ন-কাকার বাড়ী আছ। আমার মনে হয় তুমি পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষের মত শোকের হাতে নিজেকে সঁপে না দিয়ে, সাহস করে বাড়ী চলে যাও, তোমার সম্মুখে যে প্রধান কর্ত্তব্য তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দাও। শোকের হাত এড়াবার এই একমাত্র সোজা পথ। ননী (দুঃখিনী বিধবার বিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র) যখন হঠাৎ গেল, ক'মাস চুপ করে বসে থেকে ক্ষেপে যাবার উপক্রম। মাঘ মাসে গুরুদেবের (শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দগিরি মহারাজ) পদ স্পর্শ করিতে হাজরা রোডে গিয়া পাঁচ ছয় দিন ছিলাম। সুযোগমত যখন তাঁহাকে জানাই যে আমি বড় অশান্তি ভোগ করছি—আমায় শান্তি দিন; তিনি চক্ষু তুলিয়া আমার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া আমায় বললেন, 'জ্ঞান আমার কাছে। শান্তিও আমার কাছে।' আমার বুকে ও হাতের চেটোতে চাপড় মেরে বললেন, 'তোর এইখানে, আর এইখানে।' তাঁহার সেই ইঙ্গিতের মর্ম্ম আমার এই মনে হলো ইষ্টদেবকে লক্ষ্য রেখে হাতে কাজ করে গেলেই জ্ঞান-

শান্তি তুই পাওয়া যাবে। তাঁহার সেই স্পর্শ-শক্তিতে আমি শক্তি পাইয়া যেন নূতন পথ পেয়েছি। বেশ শান্তিতে দিন কাটাইতেছি—যা অনেকের পক্ষে দুর্লভ। ভাই, তুমিও তো সেই মহাপুরুষের কৃপা পাইয়াছ, সেই গুরুদেবের চরণ সদা মনে করিয়া ধৈর্য্য ধর, তুমিও উপকার পাবে, তাঁহার প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ আর পাবার ত উপায় নাই, পরোক্ষ থেকে তাঁহার কৃপা ও শক্তি তুমি নিশ্চয় লাভ করবে; তাঁহার দেখান পথে তুমি চলতে চেষ্টা কর, নিশ্চয় শান্তি পাবে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বড়ই ইচ্ছা করছে। ইতি

বৌদি

শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দগিরি মহারাজ

আশীর্ম্মালা

কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিশ্বরাণী

তোমার সংসারযাত্রার পথ শুভ হউক। তোমাদের সম্মিলিত জীবন প্রেমে কল্যাণে আনন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া সৌরভ বিকীর্ণ করুক।

১১ ফাল্গুন
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশীর্ব্বাদ।

ওহে প্রভু, কর আশীর্ব্বাদ!
প্রেমের আহ্বান গীতিতে
দুটী পাখী মিলেছে প্রীতিতে
জীবন যাত্রায় এক সাথ
তোমারে করিয়া প্রণিপাত
মন্ত্রে বাঁধি দোঁহাকার হাত
কর আশীর্ব্বাদ প্রভু, কর আশীর্ব্বাদ।

শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কল্যাণীয়াসু—

যে সত্য বলে, যে সত্যে চলে
তাকে সকলে মানে, তাঁরি জয়।

আশীর্বাদক
[illegible]

কল্যাণীয়া নিশারাণী!
অজস্র আশীষ নাও,
সুখী হও, হেসো, রও,
জীবনের উজ্জ্বলতা দাও সবসময়,

সুনীতি দেবী

" অনন্ত ধৈর্য্য, অখণ্ড পবিত্রতা
এবং অসীম অধ্যবসায় দ্বারাই সৎ
উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হয়"— স্বামী বিবেকানন্দ

[illegible]

কল্যাণীয়াসু নিশারাণী তুমি সুখে
সংসারে প্রবেশ করে উপভোগের
এ উজ্জ্বল হয়ে থাক, সবার ভালবাস-
ভালবেসো দিলেম অন্তরের স্নেহাশীষ।

শ্রী· [illegible] দেবী

কল্যাণীয়া নিশারাণি।
আশীর্ব্বাদ করি তোমার জীবন
মধুময় হউক এবং তুমি স্বামি-
সোহাগিনী হইয়া পার্ব্বতীর
সৌভাগ্য লাভ কর ইতি
শুভার্থী
হীরেন্দ্র নাথ দত্ত

ভারতবর্ষের আদর্শ অর্দ্ধনারীশ্বর।
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
১৯ চৈত্র, ১৩৩৮।

𑀢𑁆𑀭𑀺𑀦𑀺 𑀅𑀫𑀼𑀢𑀧𑀤𑀸𑀦𑀺 𑀲𑀼𑀅𑀦𑀼𑀞𑀺𑀢𑀸𑀦𑀺
𑀦𑁂𑀬𑀁𑀢𑀺 𑀲𑁆𑀯𑀕𑀁 𑀤𑀫 𑀘𑀸𑀕 𑀅𑀧𑁆𑀭𑀫𑀸𑀤

ত্রীনি অমুতপদানি সুঅনুঠিতানি
নেয়ংতি স্বগং দম চাগ অপ্রমাদ।
তিনটী অমৃতপদ সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হ'লে
স্বর্গে নিয়ে যায় — দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ॥
— খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের যবন (গ্রীক) বৈষ্ণব
দিওনের পুত্র হেলিওডোরের শিলালিপি হইতে।

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমারি গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটী চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে॥ — জ্ঞানদাস

— এই আদর্শ কোথায় গেল?

শ্রী [illegible]
৩১শে মার্চ, ৩২

যখন হইত আমি মন্দাকিনী তীরে
বসে যদি রমণী অন্তরে
সে যে মুক্তি বন্ধনে
অনাবৃত কঠোর করে?

শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত
৩১শে মার্চ ১৯৩২

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৮

স্নেহের নিশারাণী,

আজ নূতন পথে পদক্ষেপ করিবার পূর্ব্বক্ষণে তোমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে আমিও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার ভবিষ্য জীবন সুখকর কল্যাণময় ও সুন্দর হউক। জীবনপথে যাঁহাকে সহযাত্রী পাইলে তাঁহার সহিত পূর্ণমিলনে সকল শক্তি পূর্ণতর হউক, সকল উন্নত আকাঙ্ক্ষা সফল হউক। জীবনের পথ সর্ব্বথা নিষ্কণ্টক বা পুষ্পাস্তৃত হয় না, সে জন্য প্রস্তুত থাকিও। মনে রাখিও বিবাহিত জীবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম। এই প্রেম প্রতিকূল ঘটনায় ধৈর্য্য, ত্রুটীতে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা এবং সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় জীবনে মধুরতা দেয়। কিন্তু এই প্রেম কেবল দুই জনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে তাহা সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। তোমাদের মিলিত প্রেম তোমাদের চারি দিকে সকলের কল্যাণে নিয়োগ করিয়া উন্নত ও মহিমান্বিত কর। ওঁ স্বস্তি।

শ্রীকামাখ্যা...

শ্রীমতী নিশারাণী,

তুমি বাল্যকাল অবধি আমাদের স্কুলে; তোমার যে স্কুলের প্রতি ভালবাসা, যাহাকে আমি Spirit of loyalty to School ব'লে মনে করি, আর তোমার যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি এই দুটী অমূল্য জিনিস নিয়ে বরাবর চল্‌তে পারলে তোমার নূতন সাংসারিক জীবন উজ্জ্বল হবে, উপযুক্ত গৃহিণী এবং উপযুক্ত মাতা হয়ে আমাদের গৌরব রক্ষা করতে পারবে।

শ্রী সরলা রায়

ধৈর্য্যে, সহিষ্ণুতায়, প্রীতি ও প্রেমে মণ্ডিত হয়ে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সফল কোরো—এই আশীর্ব্বাদ।

শ্রী সরলা দেবী

একটু গান একটু গন্ধ
একটু রূপ একটু রং
একটু ছন্দ

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আশীর্ব্বাদ

১৭ই ফাল্গুন '৩৮

বৎসে

তোমা করি আশীর্ব্বাদ
ভারতীর লভ পরসাদ।

শ্রীকালিদাস রায়।

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্‌।

জীবনের পথ সম্মুখে বিস্তৃত। পরের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনুযোগ আপনার বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। পথের সম্বল ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও প্রেম। আশীর্ব্বাদ করি, জীবনের গতি সুখ ও মঙ্গলময় হউক।

শ্রীযতীন্দ্র বাগচী

মা নিশারাণী,

আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সমান মন, সমান চিত্ত, সমান ব্রত হইয়া স্বামীর সহিত সত্য-শিব-সুন্দরের পথে বিচরণ কর। চিরায়ুষ্মতী হইয়া পতি-সোহাগিনী হও। ইতি

শ্রী[illegible]

ভারতের পঞ্চ সতীর আদর্শ তোমার চিত্তে প্রভাব বিস্তার করুক। সীতা-সাবিত্রী-সম পতিগত-প্রাণা হও।

শ্রী[illegible] —

হে কল্যাণি!

কল্যাণে ভরুক গৃহ তব, নিত্য নব নব
আনন্দের উপাদানে উঠুক উজলি
তব গৃহস্থালি।
রমা সহ বাণী অচলা রহুন গৃহে তব,
হে কল্যাণি!

শ্রী[illegible]

কল্যাণীয়াসু—

আমার একান্ত শুভকামনা গ্রহণ কর; তোমাদের মিলিত জীবন আনন্দের হউক, সুখের হউক—শুধু তোমাদের নয়, তোমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলের।

শুভাকাঙ্ক্ষী

অমল হোম

"সুখে থেকো আর সুখী কোরো সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে!"

শ্রী প্রমথ চৌধুরী

হিন্দু নারীর ঐশ্বর্য্য কি বুঝিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিও। ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না, জ্ঞানতঃ কাহারও অনিষ্ট করিও না।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার সেন

আশীর্ব্বাদ
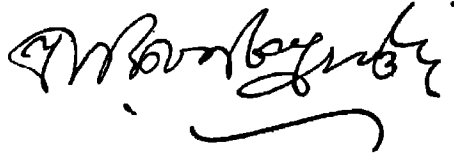
পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী নিশারাণী,

চিরায়ুষ্মতী হও, সাবিত্রীর ন্যায় লোকমান্যা হও—জীবনে পবিত্র আনন্দের অধিকারিণী হইয়া শান্তিতে দিনাতিপাত কর। তোমার গুণে তোমার স্বামীর গৃহে লক্ষ্মী অচঞ্চলা হউন। তুমি বাণীর কৃপালাভ করিয়াছ—রমা ও বাণী তোমাদের গৃহে মিলিত হইয়া পরিবারস্থ সকলের জীবন মধুময় করিয়া তুলুন। প্রজাপতির নিকটে তোমাদের চিরমঙ্গল-কামনা করিতেছি।

কল্যাণকামী

[signature]

বাগবাজার
১৭।১১।৩৮

আমার প্রাণের আশীর্ব্বাদ

Mrs K. C. De
29. 2. 32

"They also serve who
only stand and wait."

Flora Cohen
29th Feb., '32

There is so much good in the worst of us
There is so much bad in the best of us
That it ill becomes any one of us
To talk about the rest of us.

With love

Geeta

29th Feb., '32

স্নেহের নিশারাণীকে

আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ—

শ্রীরাণী ঘোষ

শ্রীমতী নিশারাণীর শুভবিবাহে স্নেহাশীর্ব্বাদ

শ্রীলীলা দেবী

১৬ই ফাল্গুন ১৩৩৮

আশীর্ব্বাদ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার বাপের বাড়ীর পালা ফুরাল,
শ্বশুর-বাড়ীর পালা আরম্ভ হলো,—
এই সন্ধিস্থলে বদলটা মনে রেখে চোলো।
তাতেই আশা করি ৺কৃপা পাবে।

শ্রীরণেন্দ্রমোহন ঠাকুর
১৭ই ফাল্গুন ১৩৩৮

জীবনে, বাক্যে ও কার্য্যে সত্য হও—
এই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা।

১।৩।৩১ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

সুখে থাক। ধর্ম্মে মন দিও ও গুরুজনার সদা শ্রদ্ধা করিও। আশা করি, ভগবান্ তোমাকে মনের সুখ দিবেন।

৩ মোহন বাগান রো শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

নারীর কর্ত্তব্য ঘরেও যেমন বাইরেও তেমন। দেশকে তুল্‌তে হলে শুধু ঘর দেখ্‌লেই চল্‌বে না বাইরেও সমানভাবে দেখ্‌তে হবে। আশা করি, তোমার জীবনে তুমি এই দুই কর্ত্তব্যের সমন্বয় করতে পারবে।

শিশিরকুমার মিত্র

ওঁ

আমার অন্তরের প্রার্থনা—তোমাদের উভয়ের জীবন সুখ, শান্তি ও আনন্দ-পূর্ণ হউক। ইতি—

শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

লহ মোর আশীর্ব্বাদ।

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু

আমার অন্তরের প্রার্থনা, তোমাদের উভয়ের জীবন সুন্দর শান্তিপূর্ণ হোক্—সর্ব্বদা "সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" স্মরণ করিও।

শ্রীসুশীলকুমার দত্ত

আশা করি, জীবনে কখনও কর্ত্তব্য-কার্য্যে অবহেলা করিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা জীবনে সুখে ও শান্তিতে থাক। ভগবানে মন রাখিও।

শ্রীবিরাজমোহন মজুমদার

শ্রীদুর্গা
শরণম্

স্নেহাস্পদ নিশারাণী,

তুমি আজ অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন জগতে প্রবেশ করিতেছ। ইহার পথ বড়ই বিঘ্নশঙ্কুল; পদে পদে স্খলিত হইবার সম্ভাবনা। তুমি পূর্ব্বকার আদর্শ রমণীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে, এবং করুণাময় ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া আত্মসংযমে তৎপর থাকিবে। সকলকে ভালবাসিবে, দেখিবে, তোমার নূতন জগৎ কত মঙ্গলময় ও কত আনন্দের হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কল্যাণ হউক ইতি—

আশীঃ
শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

তোমার শাঁখা-সিন্দুর অক্ষয় হউক, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ

[illegible]

প্রিয় মাতঃ,

তোমার মাথার সিঁদূর ও হাতের নোয়া অক্ষয় হউক।

আশীর্ব্বাদিকা
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মল্লিক

বিবাহিত জীবনের প্রধান কামনা
ব্রহ্মচর্য্য, স্বাস্থ্য-রক্ষা, জীবেতে করুণা,
গুরু-সেবা, সদাচার, আলস্য-বর্জ্জন,
ইষ্টে প্রীতি, স্বামি-সেবা, সন্তান-পালন।
দেব-দ্বিজ-পতি-শ্বশ্রূ-শ্বশুর-চরণে
অকৃত্রিম ভক্তিভাব রাখিবে যতনে।
আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে, চিরসুখী হও,
কর্ত্তব্য-পালনে সদা বিমুখ না হও।

শ্রীপ্রতিমা ঘোষ
১৭ ফাল্গুন ১৩৩৮

শ্রীশ্রীদুর্গা

আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে মতি রাখিয়া সুখে-শান্তিতে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

শ্রীহৃদয়নাথ ঘোষ

ভবিষ্যৎ ভেবে সদা ক'রে যাও কাজ,
সংসারে সকল দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে।
অন্তরে কর্ত্তব্য-জ্ঞান করুক বিরাজ,
সবার হৃদয়ে দাও মধু-স্মৃতি এঁকে।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

কল্যাণীয়াসু

তোমার নূতন পথ
সুখ-সৌন্দর্য্য শান্তিতে
উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

আশীর্ব্বাদ।

১৭ই ফাল্গুন ১৩৩৮ শ্রীগণপতি সরকার

শ্রীশ্রীগোবিন্দায় নমঃ

কল্যাণীয়াসু,

জন্ম-এয়ো হইয়া, ধর্ম্মে মতি রাখিয়া চিরসুখী হও। দেশ ও মানবের সেবায় তব শক্তি নিয়োগ করিও। সুখ—ত্যাগে ও আত্মসন্তোষে।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড
১৭ ফাল্গুন ১৩৩৮

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

নিশারাণীর স্মৃতি-কণা খোকন

সান্ত্বনার বাক্য

জ্যোতিষবাবুর কন্যা উমারাণী এখন পরলোকগত। জীবনে একটিবার মাত্র তাকে দেখেছি,—বৎসর কয়েক পূর্ব্বে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ভিড়ের মধ্যে। অনেকগুলি মেয়ের অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে সে সকলের জন্যে আমার কাছে চাইতে এসেছিল আমার হাতের সই। তারপরে আর তাকে দেখিনি।

অনেক দিন পরে হঠাৎ তার মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পেলাম আমার এক বন্ধুর মুখে। কিন্তু যে-মেয়ে আমার আত্মীয়া নয়, যাকে একবারের বেশি দেখিনি তার মৃত্যু মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন-বিহীন প্রবাসে সে দিন শোকোন্মত্ত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম বেদনার যে বিবরণ শুনেছিলাম সে যেমন করুণ তেমনি মর্ম্মান্তিক। সে কাহিনী ভুলে যাওয়া কঠিন। এই বালিকা ছিল এক দিকে কন্যা, অন্য দিকে পিতার অভিভাবিকা; তাঁর সকল ভারই ছিল মেয়ের পরে। সেই কন্যা, সেই একান্ত অবলম্বন, যার আকস্মিক মরণের নির্ম্মম আঘাতে এক মুহূর্ত্তে ঘুচে গেল চিরদিনের মতো, সেই দুঃখময় পিতৃ-হৃদয়ে সান্ত্বনা এনেদিতে পারি এমন ভাষা আমি জানিনে। কেবল জানি যে-পথ দিয়ে একদিন এসেছিল মরণ, সেই পথ ধরেই আর একদিন আসবে সান্ত্বনা,—নীরবে, সকলের অগোচরে। সন্তান-হারার অপরিমেয় বেদনা শান্ত ক'রে দিতে পারে শুধু সে-ই। আর কেউ নয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তবু মন মানে না। তাই বন্ধুজনের কাছে সান্ত্বনার বাক্য সংগ্রহ ক'রে তাতে আপন দুঃখের অদৃশ্য সূত্র যোজনা ক'রে জ্যোতিরবাবু কন্যার মৃত্যু-স্মৃতি গেঁথে রাখতে চান। ভুলে যেতে চান না। এই ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হোক আমি এই কামনা করি।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

খোকন